অতীত ও ঐতিহ্য

ষষ্ঠ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৭

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত ষষ্ঠশ্রেণির পাঠ্যপুস্তক *অতীত ও ঐতিহ্য* প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য বইটিতে ধাপে ধাপে অতীত বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ – এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য যুগোপযোগী ছবি এবং মানচিত্র প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ইতিহাস বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নানা তালিকা ও রেখচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

অতীত ও ঐতিহ্য বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম *অতীত ও ঐতিহ্য*। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আলাদা বিষয় হিসেবে ইতিহাস-এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হবে। এই বইতে আখ্যানমূলক বিবরণের মাধ্যমে গল্পচ্ছলে এক একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিড়ম্বিত না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে যায়। সেই অতীতের বিশেষ স্থান-কালের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচর্যার যথাযথ মূর্ত অবয়ব যেন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বেশ কিছু প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী-- 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো'। সেগুলির মাধ্যমে হাতে-কলমে এবং স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুদ্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-সহায়তা

অনির্বাণ মণ্ডল
কৌশিক সাহা
প্রদীপ কুমার বসাক
সত্যসৌরভ জানা
সঞ্জয় বড়ুয়া
সুগত মিত্র

গ্রন্থসজ্জা

প্রচ্ছদ : সুব্রত মাজি
অলংকরণ : প্রণবেশ মাইতি ও সুব্রত মাজি
মানচিত্র নির্মাণ : হিরাব্রত ঘোষ
মুদ্রণ সহায়তা : অনুপম দত্ত ও বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. **ইতিহাসের ধারণা**	২
২. **ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ :** যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপন	১৬
৩. **ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা :** প্রথম পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-১৫০০ অব্দ	২৮
৪. **ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা :** দ্বিতীয় পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ	৪৪
৫. **খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ :** রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বির্বতন - উত্তর ভারত	৬৪
৬. **সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন :** আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ	৭৮
৭. **অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা :** আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ	৯৮
৮. **প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক :** শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প	১১০
৯. **ভারত ও সমকালীন বহির্বিশ্ব :** খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত	১৩২

- **তোমার পাতা**
- **শিখন পরামর্শ**

১

ইতিহাসের ধারণা

বছরের শুরুতে একটা নতুন বই। ইতিহাসের বই। অনেকেই হয়তো ভাবছ যে ইতিহাস খুব পড়তে হবে। মুখস্থ করতে হবে। মনে রাখতে হবে অনেক নাম, সাল-তারিখ। অথচ, যদি গল্পের মতো সহজে পড়া যায় ইতিহাস বইটা? যদি থাকে অনেক ছবি, মজার কথা, অজানা কথা। তাহলে আনন্দ করে পড়া যায় ইতিহাস বই। ইতিহাস শব্দের একটা মানে পুরোনো দিনের কথা। আর পুরোনো দিনের কথা শুনতে নিশ্চয়ই তোমরা ভালোবাসো। চলো দেখা যাক, গল্পের মতো মজা পাওয়া যায় কিনা ইতিহাস পড়ে।

ক্লাস ফাইভের *আমাদের পরিবেশ* বইতে রুবির দাদুর কথা সবার মনে আছে নিশ্চয়। দাদু একদিন রুবির বন্ধুদের বাড়িতে ডাকলেন। বিকালে দলবেঁধে গেল সবাই দাদুর কাছে। গল্পের মাঝখানে দাদু উঠে গিয়ে তিনটে জিনিস নিয়ে এলেন। একটা পাথরের শিলনোড়া। একটা লোহার হামানদিস্তা। আর একটা মেশিন। পলাশ জানতে চাইল, মেশিনটা কী কাজে লাগে? দাদু বললেন, এটা দিয়েও মশলাপাতি বাটা যায়। এটা বিদ্যুতে চলে। একে মিকসার মেশিন বলে। রিয়া বলল, এটা তো আগে কখনও দেখিনি। দাদু বললেন, আমাদের ছোটোবেলায়ও এই মেশিন দেখিনি। শুধু শিলনোড়া আর হামানদিস্তা দেখেছি। তখন অবশ্য পাথরের হামানদিস্তাও ছিল।

১.১ কবে, কেন, কীভাবে, কোথায় ?

স্কুলে একদিন পাথর আর ধাতুর ব্যবহার নিয়ে কথা হচ্ছিল। সালাম তখন রুবির দাদুর গল্পটা দিদিমণিকে বলল। শুনে দিদিমণি বোর্ডে শিলনোড়া, হামানদিস্তা আর মিকসার মেশিনের ছবি আঁকতে বললেন। পৃথা আঁকল। দিদিমণি এবার তন্ময়কে ডাকলেন। জানতে চাইলেন, বলোতো এই তিনটের মধ্যে কোনটির ব্যবহার মানুষ আগে শিখেছে? তন্ময় বলল, শিলনোড়ার ব্যবহার। কারণ পাথরের ব্যবহার মানুষ আগে শিখেছে। দিদিমণি বললেন, তারপরে কোনটা? সালাম বলল, ধাতুর হামানদিস্তা। পাথরের পরে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখেছে। তবে দাদু বলেছেন, আগে পাথরের হামানদিস্তাও ব্যবহার হতো। দিদিমণি বললেন, উনি ঠিকই বলেছেন। অনেক পুরোনো দিনেও মানুষ পাথরের হামানদিস্তার ব্যবহার জানত। আজও কিন্তু পাথরের হামানদিস্তা ব্যবহার করা হয়। পৃথা বলল, তাহলে মিকসার মেশিন এসেছে সব শেষে। কারণ বিদ্যুতের ব্যবহার মানুষ অনেক পরে শিখেছে। দিদিমণি বললেন, এটাই ইতিহাসের গল্পের গোড়ার কথা। **কোনটা আগে, কোনটা পরে**। মানে সময়ের হিসাবে *কবে* কোনটা এসেছে সেটা প্রশ্ন করা। মানুষ, ঘটনা বা জিনিস — সেটা *কবে* এল? এর সঙ্গে তোমরা আরেকটা কাজ করলে। কেন এই তিনটে জিনিস আগে-পরে এসেছে তার কারণটাও বললে। আগে-পরে হওয়ার কারণ, মানে *কেন* আগে ও পরে সেটা জানতে হবে। ইতিহাসের গল্পের পরের ধাপ এটাই। অরুণ বলল, তারপরের ধাপ কী? দিদিমণি বললেন, এবারে প্রশ্ন করতে হবে, *কীভাবে* ? মানে, কীভাবে মানুষ পাথরের শিলনোড়ার ব্যবহার শিখল? আবার কীভাবে ধাতুর হামানদিস্তা বানাতে পারল? সেইসঙ্গে জানতে হবে এসব কাজ *কোথায়* হলো। কারণ, এক জায়গায় কিছু মানুষ একটা সময়ে একরকম কাজ করত। আবার অন্য জায়গায় অন্য মানুষ ঐ একই সময়ে অন্যরকম কাজ করত। তাই *কবে, কেন, কীভাবে, কোথায়* দিয়েই ইতিহাসের গল্প শুরু হয়।

অনেক অনেক দিন আগের কথা

শ্যামল একটা গল্পের বইতে পড়েছিল, *অনেক অনেক দিন আগে ওখানে জঙ্গল ছিল না। সুন্দর একটা বাড়ি ছিল*। শ্যামলের মনে হয়েছিল, অনেক অনেক দিন আগের কথা জানা যায় কীভাবে? ইতিহাস ক্লাসে ও দিদিমণিকে সেটাই জানতে চাইল। দিদিমণি বললেন, অনেক অনেক দিন আগের কথা সবটা জানা যায় না। পুরোনো দিনের লেখা পড়ে, ছবি দেখে জানা যায় কিছু কথা। বয়স্ক মানুষদের কথা শুনে কিছুটা জানা যায়। তবে যদি খুব পুরোনো দিন হয়? যে সময়ের ছবি নেই, লেখা নেই? যে সময়ের কোনো মানুষ আজ বেঁচেও নেই? সেইসব দিনের অনেক কথাই ইতিহাসের বই পড়ে জানা যায়। আবার গল্পেও অনেক পুরোনো দিনের কথা লেখা থাকে। তবে মনে রেখো, গল্পের বইতে লেখা পুরোনো দিনের সব কথাই ইতিহাস নয়। ধরো, রূপকথার গল্পে তোমরা ডানাওলা পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা পড়ো। তেমন ঘোড়া কিন্তু অনেক দিন আগে ছিল না। সেটা মানুষের মনের কল্পনা। ইতিহাসের কথা তেমন মনগড়া নয়। তাই পুরোনো দিনের যেসব কথা গল্পে থাকে, তা সবসময় ইতিহাস নয়। ধরো, আদিম মানুষ ডানাওলা ঘোড়ায় চড়ে উড়ে বেড়াত। এমন কথা কোনো ইতিহাস বইতে লেখা থাকবে না। তাই ইতিহাসের কথা গল্পের মতো হলেও, সত্যি।

টুকরো কথা

নদীমাতৃক সভ্যতা

সেই কবে থেকেই মানুষ নদীর ধারে থাকতে শুরু করেছিল। নদীকে ঘিরেই তাদের রোজকার বেশিরভাগ কাজ চলত। পুরোনো দিনের অনেক সভ্যতা (সভ্যতা কাকে বলে তা জানবে তৃতীয় অধ্যায়ে) নদীর উপর নির্ভর করেই তৈরি হয়েছিল। সেইসব সভ্যতার কাছে নদী ছিল মায়ের মতো। তাই সেগুলিকে নদীমাতৃক সভ্যতা বলা হয়। মাতৃক মানে মায়ের মতো। সেখানকার লোকজনের কাজকর্মে নদীর গুরুত্ব ছিল সবথেকে বেশি।

১.২ ইতিহাসের কথা, মানুষের কথা

আবার একদিন বিকালে সবাই মিলে গেল রুবির দাদুর কাছে। দাদুকে বলল দিদিমণি গল্প আর ইতিহাস নিয়ে কী বলেছেন। দাদু বললেন, তাইতো গল্পের বইতে শুধু বলা থাকে *অনেক অনেক দিন আগের কথা*। কবেকার কথা সেটা ঠিকমতো বলা থাকে না। কিন্তু ইতিহাস বইতে কোনো না কোনো সময়ের হিসাব থাকে।

অরুণ বলল, আচ্ছা, দাদু ইতিহাসে খালি মানুষের কথাই বলা থাকে কেন? দাদু বললেন, মানুষ ছাড়া আর কেউ যে পুরোনো দিনের কথা জানতে চায় না। বাঘ-সিংহ, গোরু-ছাগলদের তো বাবার নাম, মায়ের নাম, ঠাকুরদার নাম এইসব জানতেও চায় না কেউ। মানুষের সেসব জানার দরকার হয়। তাই মানুষকে পুরোনো দিনের কথা জানতে হয়। পুরোনো দিনের কথাই ইতিহাসের কথা। তাই ইতিহাসে বেশিরভাগ মানুষের কথাই থাকে। তবে তার সঙ্গে থাকে

পরিবেশের কথা। মানুষ কীভাবে এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলল সেসব কথা। সেই সঙ্গে থাকে মানুষের নানা কাজকর্মের খোঁজখবর। কীভাবে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল। কীভাবে পোশাক পরতে শিখল। কীভাবে ছবি আঁকতে, পড়তে-লিখতে শিখল। একজোট হয়ে থাকতে শিখল কীভাবে। কীভাবে রান্না করতে শিখল, বাড়ি বানাল, গ্রাম-শহর তৈরি করল। নদীতে বাঁধ দিল। চাষ-আবাদ করল। গান গাইল, বাজনা বাজাল। রকেট তৈরি করল। সেই কবেকার আদিম মানুষ ইশকুলে যেত না। আজ তোমরা কত শক্ত অঙ্ক করো। কম্পিউটারে কাজ করো। এই এত সব *কবে? কেন? কীভাবে? কোথায়* হলো?— সেসব কথাই ইতিহাসের কথা।

১.৩ ইতিহাস আর ভূগোল

পরদিন ক্লাসে দিদিমণি বললেন, ইতিহাস বুঝতে হলে ভূগোল জানতে হয়। একথায় সবাই তো অবাক! ওদের ভূগোল বই আর ইতিহাস বই আলাদা। আলাদা ক্লাস হয়। তাহলে দিদিমণি এমনটা কেন বললেন? পৃথা সেটাই জানতে চাইল। দিদিমণি বললেন, আসলে মানুষের কাজকর্মই তো ইতিহাসের বিষয়। আর মানুষের অনেক কাজই তার পরিবেশ ও ভূগোল দিয়ে ঠিক হয়। ধরো, নদীর পাশে যারা থাকেন তাঁরা একভাবে বাঁচেন। তাঁদের রোজকার কাজকর্মে নদীর অনেক গুরুত্ব। আবার অনেকে মরুভূমি অঞ্চলে থাকেন। তাঁদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নদীর গুরুত্ব কম। দেখবে মরুভূমির লোকেরা অনেকেই উটে চড়ে যাতায়াত করেন। আর নদীর কাছে যাঁরা থাকেন তাঁরা অনেকেই নৌকায় যাতায়াত করেন। এবারে দেখো, আমরা অনেকে নদী পেরোতে নৌকায় চড়ি। আবার রাজস্থানে উট আছে। সেখানে লোকে মরুভূমি পেরোতে উটে চড়েন। এটা অনেকদিন থেকেই হয়ে আসছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যানবাহনের ইতিহাসে জানা যাবে নৌকার কথা। অন্যদিকে রাজস্থানের যানবাহনের ইতিহাসে থাকবে উটের কথা। এখন একেকটা জায়গায় যানবাহনের ইতিহাস আলাদা হলো কেন? কারণ, পরিবেশ ও ভূগোল আলাদা। আর তাই এক এক পরিবেশে, অঞ্চলে ইতিহাস এক এক রকম। খাবার, পোশাক, যানবাহন, ব্যবসাবাণিজ্য, কাজকর্মের নানান তফাত। খুব ছোটো জায়গা থেকে খুব বড়ো জায়গা সবখানেই এটা ঘটবে। ধরো, সমতল অঞ্চলের লোকেরা ভাত বেশি খান কেন? রাহুল বলল, সমতলে ধান চাষ বেশি হয়, তাই। দিদিমণি বললেন, ঠিক। পলাশ বলল, কিন্তু আমার কাকা রাজস্থানে থাকে। ওখানে ধান চাষ বেশি হয় না। কাকার বাড়িতে রুটিই বেশি খাওয়া হয়। দিদিমণি বললেন, এভাবেই মানুষের বেশিরভাগ কাজকর্ম তার পরিবেশ আর ভূগোলমাফিক চলে। তাই ইতিহাস বুঝতে গেলে সবসময় ভূগোলটাও জানা দরকার। মনে আছে ইতিহাসের গল্পের দুটো কথা ছিল- *কেন* এবং *কোথায়* ? সেই *কেন* এবং *কোথায়* জানার জন্যই পরিবেশ আর ভূগোল জানা দরকার।

ভারতীয় উপমহাদেশের ভূগোল-ইতিহাস

দিদিমণি বললেন, তোমরা সবাই এখনকার ভারতের মানচিত্র দেখেছো। তবে এই মানচিত্রটা সবসময়ে এমন ছিল না। অনেক অনেক দিন আগে ভারতের মানচিত্র অন্যরকম ছিল। বিরাট সেই অঞ্চলকে একসঙ্গে বলা হতো *ভারতীয় উপমহাদেশ*। *উপমহাদেশ* মানে প্রায় একটা মহাদেশের মতোই বড়ো অঞ্চল। সেখানে নানারকম পরিবেশ ও মানুষ। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি সবমিলিয়ে উপমহাদেশের পরিবেশ। মানুষের খাবার, পোশাক, ঘরবাড়িও নানা রকম । এই হরেকরকম মিলেমিশে বিরাট এলাকা নিয়ে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। তার উত্তরদিকে ছিল পাহাড়ি অঞ্চল। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর দু-পাশের বিরাট সমভূমি অঞ্চল। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণদিকের তিনকোণা অঞ্চল। এই নিয়ে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ভূগোল।

ভারতীয় উপমহাদেশকে একসময় *ভারতবর্ষ* বলা হতো। *ভরত* ছিল পুরোনো একটা জনগোষ্ঠী। ঐ জনগোষ্ঠী যে অঞ্চলে থাকত তাকে বলা হতো ভারতবর্ষ। *ভারত* শব্দের একটি অর্থ ভরতের বংশধর। তবে *ভারতবর্ষ* বলতে সবসময় পুরো ভারতীয় উপমহাদেশকে বোঝাত না।

মানচিত্র ১.১ : ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্র

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

১.৪ পুরোনো দিনের হিসেব-নিকেশ

একদিন দিদিমণি বললেন, আজ আমরা পুরোনো দিনের হিসাব করা শিখব। তোমাদের মনে আছে ইতিহাস শেখার প্রথম ধাপ কী? সবাই বলল, *কবে* - এই প্রশ্ন করা। দিদিমণি বললেন, বলোতো, ভারতে প্রথম যাত্রী নিয়ে ট্রেন কবে চলে? সবাই বলল, ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল। দিদিমণি বললেন, বাঃ! বেশ মনে আছে তো! এবারে বলোতো, মানুষ কবে চাকা আবিষ্কার করেছে, কবে আগুন জ্বালাতে শিখেছে? এই প্রশ্ন দুটোর উত্তর ওরা জানে না। দিদিমণি বললেন, উত্তরগুলো তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে। পারবে তো? সবাই রাজি। দিদিমণি বললেন, একটা সময় ছিল যখন ঘড়ি ছিল না। ক্যালেন্ডার ছিল না। মানুষ লিখতে পারত না। তাই কেউ সাল-তারিখ দিয়ে লিখে রাখেনি কবে মানুষ প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। অনেক অনেক পুরোনো দিনের হিসাব নিয়ে সেই জন্যই মুশকিল হয়। তবে কাজের সুবিধার জন্য নানা ভাগে ভাগ করতে হয় পুরোনো সময়কে। এই ভাগগুলোর হিসাব আলাদা আলাদা। ধরো, হাজার হাজার বছর মানুষ শুধু পাথরের ব্যবহার জানত। কিন্তু, ঠিক কবে পাথরের ব্যবহার শুরু হয়, সে-কথা কোথাও লেখা নেই। তাই ঐ হাজার-হাজার বছরকে বোঝাতে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেটা হলো *যুগ*। মোটামুটিভাবে অনেক লম্বা একটা সময় বোঝাতে *যুগ* কথাটা বলা হয়। আবার ধরো, হাজার-হাজার বছর এই পৃথিবীতে বরফ জমে ছিল। সেই লম্বা সময়কে বোঝাতে *তুষার* (বরফ) *যুগ* কথাটা বলা হয়। একসময়ে মানুষ তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা এইসব ধাতুর ব্যবহার শিখল। সেই সময়টাকে বোঝাতে *ধাতুর যুগ* বলা হয়। কিন্তু ধাতুর যুগের মধ্যেও ভাগ আছে। যখন শুধু তামার ব্যবহার জানত, সেটা *তামার যুগ*। তেমনি পরে যখন লোহার ব্যবহার শিখল, তখন শুরু হলো *লোহার যুগ*। তবে লোহার যুগেও পাথর, তামা এসবের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল না। কিন্তু, লোহাই তখন সবচেয়ে বেশি কাজে লাগল। লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই মানুষ সহজে কাজ সারতে পারল। তাই ঐ সময়টার নাম হলো *লোহার যুগ*।

কিন্তু, ঠিক কবে কোন যুগ শেষ হলো? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। তাই সেসবের উত্তর দিতে গিয়ে একটা কথা জুড়ে দেওয়া হয় — *আনুমানিক*। তার মানে অনুমান বা আন্দাজ করে নেওয়া হয়েছে এমন। অনেক সময় পুরোনো দিনের সাল-তারিখ আন্দাজ করে নিতে হয়। সময়ের হিসাবের সঙ্গে *আনুমানিক* কথাটা ব্যবহার করতে হয়।

টুকরো কথা

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য

ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে ভাগ করেছে বিন্ধ্য পর্বত। সাধারণভাবে আর্যরা উত্তর অংশে বাস করত বলে ঐ অঞ্চলকে **আর্যাবর্ত** বলা হতো। আর্যাবর্তের সীমানা নানা সময়ে বদলেছে। একসময়ে আর্যাবর্ত বলতে প্রায় পুরো উত্তর ভারতকেই বোঝানো হতো। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকে আর্যদের বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না। এই দক্ষিণভাগকেই বলা হতো **দাক্ষিণাত্য**। বিন্ধ্য পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা ছিল দাক্ষিণাত্য অঞ্চল। দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল দাক্ষিণাত্যে। কাবেরী নদীর দক্ষিণ অংশকে তাই **দ্রাবিড় দেশ**ও বলা হতো। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের ভাষাগুলিকে দ্রাবিড় ভাষা বলা হতো।

টুকরো কথা
প্রাক-ইতিহাস, প্রায়-ইতিহাস, ইতিহাস

ইতিহাস কত পুরোনো দিনের কথা বলে? একসময় মানুষ লিখতে পারত না। সেই সময়ের কথা আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। এই সময়কে অনেকে *প্রাক-ঐতিহাসিক* যুগ বলেন। *প্রাক* মানে আগের। তাহলে *প্রাক-ইতিহাস* মানে ইতিহাসের আগের সময়। আবার একসময়ে মানুষ লিখতে শিখল। কিন্তু, সেই সময়ের পাওয়া সব লেখা আজও পড়া যায়নি। অর্থাৎ, পুরোনো সময়ের লেখা পাওয়া যায়, কিন্তু পড়া যায় না। সেই পুরোনো সময়টাকে বলা হয় *প্রায়-ঐতিহাসিক যুগ।* যে সময়ের লেখা পাওয়া যায় ও পড়া যায় তা হলো *ঐতিহাসিক যুগ*। তবে এই ভাগাভাগিগুলো নেহাতই কাজ চালানোর জন্য করা। ইতিহাস পুরোনো দিনের কথা বলে। সে যত পুরোনোই হোক। তখন মানুষ লিখতে পারুক আর নাই পারুক। সেসব লেখা পড়া যাক বা না যাক। পুরোনো দিনের কথাই ইতিহাসের কথা।

???

ভেবে দেখো

একটি ক্যালেন্ডার নাও। সেটি ভালো করে দেখো। কোন বঙ্গাব্দ, কোন শকাব্দ এবং কোন খ্রিস্টাব্দের ক্যালেন্ডার সেটি?

সাল-তারিখের নানারকম

মানুষ লিখতে শেখার পর থেকেই সহজ হলো পুরোনো দিনের কথা জানা। তাই *কবে?* প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে লাগল অনেক সহজে। *আনুমানিক* কথার দরকার কমে এল আস্তে আস্তে। সময়ের হিসাব করা সহজ হলো। *সাল* কথাটা তোমরা জানো। সাল বোঝাতে *অব্দ* ও *বছর* কথাগুলোও ব্যবহার হয়। ইতিহাসে নানারকম অব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কোনো বড়ো বা জরুরি ঘটনাকে ধরে অব্দ গোনা হতো। রাজাদের শাসন ধরেও অব্দ গোনা চালু ছিল। যেমন, *কনিষ্কাব্দ, গুপ্তাব্দ, হর্ষাব্দ* ইত্যাদি। কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে সেরা ছিলেন কনিষ্ক। তিনি সিংহাসনে বসে এক নতুন অব্দ গোনা চালু করেন। সেই অব্দ গণনাকে *কনিষ্কাব্দ* (কনিষ্ক + অব্দ) বলে। কনিষ্কাব্দের আর এক নাম *শকাব্দ*। ধরা হয় ৭৮ খ্রিস্টাব্দে কনিষ্ক সিংহাসনে বসেন। তাহলে খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৮ বাদ দিলে কত *শকাব্দ* তা জানা যাবে।

গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত একটা অব্দ গণনা চালু করেন, তাকে *গুপ্তাব্দ* বলা হয়। ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ *গুপ্তাব্দ* গণনা শুরু হয়। হর্ষবর্ধনও রাজা হওয়ার সময় (৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে *হর্ষাব্দ* গণনা চালু করেন।

টুকরো কথা
খ্রিস্টপূর্বাব্দ ও খ্রিস্টাব্দ

যিশু খ্রিস্টের জন্মকে ধরে যে অব্দ বা সাল গোনা হয় তা হলো *খ্রিস্টাব্দ* (খ্রিস্ট + অব্দ)। খ্রিস্টাব্দ অনুসারেই সাধারণভাবে ইতিহাসের সাল-তারিখ হিসাব করা হয়। যিশুর জন্মের আগের সময়কে বলা হয় *খ্রিস্টপূর্বাব্দ*। *পূর্ব* মানে এখানে *আগের*। তাহলে *খ্রিস্টপূর্বাব্দ* মানে হলো খ্রিস্টের জন্মের আগের অব্দ গণনা [খ্রিস্ট + পূর্ব (আগের) + অব্দ (সাল গণনা)]। মজার ব্যাপার হলো, খ্রিস্টপূর্বাব্দ বড়ো থেকে ছোটোর দিকে গোনা হয়। মানে সেখানে ৫,৪,৩,২,১ — এভাবে গোনা হয়। আর খ্রিস্টাব্দ গোনা হয় ছোটো থেকে বড়োর দিকে। যেমন ১,২,৩,৪,৫। তাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের আগের বছর হবে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ। পরের বছর হবে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ। আর খ্রিস্টপূর্বাব্দ হলে উলটো হবে। ২০১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগের বছর হবে ২০১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। পরের বছর হবে ২০১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

এখানে আর একটা মজার ব্যাপার আছে। খ্রিস্টীয় শতক গোনার সময় দেখবে একধাপ করে এগিয়ে গোনা হয়। যেমন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। এটা কিন্তু খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতক নয়, খ্রিস্টীয় বিংশ শতক। কেন? কারণটা খুব সহজ। যিশুর জন্মের থেকে প্রথম ১০০ বছর হলো খ্রিস্টীয় প্রথম শতক। যিশুর জন্মের ১০১ বছর থেকে ২০০ বছর হলো খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক। তাহলে হিসাবটা হবে এমন —

৩০০-২০১	খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক	১-১০০	খ্রিস্টীয় প্রথম শতক
২০০-১০১	খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক	১০১-২০০	খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক
১০০-১	খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক	২০১-৩০০	খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক

এভাবেই ১৮০১-১৯০০ হলো খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতক। ১৯০১-২০০০ হলো খ্রিস্টীয় বিংশ (কুড়ি) শতক। আর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ হলো খ্রিস্টীয় একবিংশ (একুশ) শতক। মনে রেখো প্রথম খ্রিস্টাব্দ মানে যিশু যে বছরে জন্মেছিলেন। আর খ্রিস্টীয় প্রথম শতক মানে যিশুর জন্মের পর থেকে একশো বছর।

সময় গোনার আর একটা হিসাবও দেখা যায়। সেটা হলো একসঙ্গে কয়েকটা বছর ধরে গোনা। ধরো, হাজার বছর একসঙ্গে হলে হয় *সহস্রাব্দ* (সহস্র (হাজার) + অব্দ)। আবার একশো বছর বোঝাতে *শতাব্দ* (শত (একশো) + অব্দ) কথাটা ব্যবহার হয়। শতাব্দকে *শতাব্দী* বা *শতক*ও বলা হয়। দশ বছর একসঙ্গে বোঝাতে *দশক* কথাটা ব্যবহার হয়। তবে দশাব্দ বলা হয় না।

১.৫ বলা, আঁকা, লেখা

একদিন দিদিমণি ইতিহাস ক্লাসে একটা মজার কাজ দিলেন। বললেন, আমি কথা বলব না। হাত নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি করব। তোমরা সেটা দেখে বলবে আমি ঠিক কী বলতে চাইছি। সবাই খুব মজা পেল। দিদিমণি হাত নেড়ে অনেক কিছু বোঝালেন। প্রথমে বুঝতে একটু অসুবিধা হলো সবার। আস্তে আস্তে ওরা অনেকটাই ঠিকমতো বুঝতে পারল। দিদিমণি বললেন, এবারে আমি বোর্ডে ছবি এঁকে দেবো। ছবিগুলো দেখে বুঝতে হবে আমি কী বলতে চাইছি। প্রথমে কেউই বুঝতে পারল না ছবিগুলোর মানে কী। বেশ খানিকক্ষণ ভেবে পৃথা প্রথমে বলল। তারপরে বাকিরাও বুঝতে পারল। দিদিমণি বললেন, এটাই ইতিহাসের আরেকটা গল্প। একসময়ে মানুষ কথা বলতে পারত না। তখন হাত-মাথা নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি করত। সেগুলো থেকেই একে অন্যের মনের ভাব বুঝত। তারপরে তারা শিখল ছবি আঁকতে। তখন ছবি এঁকে তারা মনের কথা অন্যদের বোঝাত। সবাই মিলে যা করত, তার ছবি এঁকে রাখত। গুহার পাথরের দেয়ালে, মাটির গায়ে, ধাতুর পাতে। পরে একসময়ে ছবি এঁকে এঁকেই অক্ষর বোঝাত। ধরো, *ক* আর *খ* পাশাপাশি বসেছে। হয়তো তার মানে খিদে পেয়েছে। আবার, *ক আর গ* পাশাপাশি বসল। তাহলে হয়তো ঘুম পেয়েছে বোঝানো হচ্ছে। এভাবেই ধীরে ধীরে মানুষ কথা বলতে, ছবি আঁকতে, লিখতে শিখেছিল। তবে এসব শিখতে হাজার-হাজার বছর সময় লেগেছিল। সেইসব ছবি, লেখার কিছু কিছু আজও আছে। তার থেকেই সেই সময়ের মানুষের কথা জানা যায়।

মাটির ওপরে ইতিহাস, মাটির নীচে ইতিহাস

রাহুল বলল, শুধু ছবি আর লেখা থেকেই কি ইতিহাস জানা যায়? পুরোনো দিনের কি অনেক লেখা পাওয়া যায়? দিদিমণি বললেন, না, অনেক লেখা পাওয়া যায় না। আবার যা লেখা পাওয়া যায়, তার সব পড়া যায় না। তাইতো পুরোনো দিনের সব কথা জানা যায় না। তবে ছবি আর লেখা ছাড়া আরো নানা কিছু থেকে ইতিহাস জানা যায়। যেমন ধরো, ঘরবাড়ি, বাসনপত্র, পোশাক।

আবার মুদ্রা, গয়না, অস্ত্র-শস্ত্র, মূর্তি। এমন নানা জিনিস থেকে পুরোনো দিনের কথা জানতে পারা যায়। তবে এসব জিনিসও সবসময় পাওয়া যায় না। ভেঙে গিয়ে বা মাটির নীচে চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া জিনিসগুলো খুঁজে পাওয়া যায় অনেক সময়ে। এইসব জিনিসগুলোই পুরোনো দিনের সাক্ষ্য। ধরো, ইতিহাস একটা শরীর। আর এই সবগুলো শরীরের হাড়। সেই টুকরো টুকরো হাড় জুড়ে ইতিহাসের কঙ্কাল তৈরি হয়। এগুলোকেই ইতিহাসের *উপাদান* বলে। মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া উপাদানগুলো খুঁজে বের করেন *প্রত্নতাত্ত্বিক* বা *পুরাতাত্ত্বিক*। *প্রত্ন* বা *পুরা* মানে পুরোনো। *তাত্ত্বিক* মানে ধরো পণ্ডিত মানুষ। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক মানে পুরোনো মানুষ নয়।

খুঁজে পাওয়া পুরোনো জিনিসগুলোকে বলে প্রত্নবস্তু বা পুরাবস্তু। পুরোনো দিনের সেইসব জিনিস থেকে অনেক কিছু জানা যায়। তবে সেগুলো অনেকটাই আন্দাজ। কারণ, সেই পুরোনো দিনগুলো আমরা চোখে দেখিনি। তাও পুরোনো দিনের লেখা পড়া গেলে সুবিধা হয়। কিন্তু যেসব লেখা পড়া যায় না? বা যে সময়ের লেখাই পাওয়া যায় না? সেইসব পুরোনো দিনের কথা জানতে মাটি খুঁড়ে পাওয়া জিনিসগুলোই কাজে লাগে। এভাবে মাটির উপরে ও নীচে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের নানা রকম উপাদান। সেই টুকরো টুকরো উপাদান খুঁজে জুড়ে নেন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। তার থেকে পুরোনো দিনের কথা জানতে পারা যায়।

টুকরো কথা

জাদুঘর

জাদুঘর এই কথাটা তোমাদের অনেকেরই জানা। তবে সেই ঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না। মাটির নীচের থেকে পাওয়া পুরোনো দিনের নানা প্রত্নবস্তু যত্ন করে রাখা থাকে। আর থাকে মাটির উপরে পাওয়া নানা জিনিসও। থাকে হারিয়ে যাওয়া বিশাল জন্তুর হাড়। আবার থাকে রাজা-রানিদের পোশাক, অস্ত্র-শস্ত্র। নানারকম মূর্তি, ছবি, বইপত্র। আরও কত কী! পৃথিবীর নানা জায়গায় নানাধরনের জাদুঘর দেখা যায়। ইংরাজিতে জাদুঘরকে বলে **Museum** (মিউজিয়ম)। কলকাতা শহরে একটা বিরাট জাদুঘর আছে।

১.৬ টুকরোগুলো জুড়তে জুড়তে

স্কুলের শেষে বিকালে সবাই রুবিদের বাড়িতে গেল। দাদু আজ একটা মজার খেলা দেখালেন ওদের। কতগুলো টুকরো জুড়ে জুড়ে তৈরি হচ্ছে একটা ছবি। খেলাটার নাম *জিগ-স পাজল*। দাদু বললেন, ইতিহাসও এই খেলার মতো। টুকরো টুকরো উপাদান জুড়ে জুড়ে পুরো ছবিটা বানাতে হয়। যেখানে টুকরো পাওয়া যায় না বা হারিয়ে যায়, সেখানে ফাঁক থাকে।

পরদিন দিদিমণিকে ওরা বলল জিগ-স পাজলের কথা। দিদিমণি বললেন, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা এইভাবেই পুরোনো দিনের ছবিটা সাজান। সব টুকরোগুলো একসঙ্গে পাওয়া যায় না। খুঁজতে হয়, ভাবতে হয়। তাইতো পুরোনো দিনের কথা জানার এত মজা। ঠিক যেন এই জিগ-স পাজল খেলাটার মতো। এই বছরে তোমরা অনেক ওরকম *পাজল* নিজেরাই বানাতে পারো। সেই আদিম মানুষের কথা থেকে শুরু হবে তোমাদের জানা। তারপর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের হাজার-হাজার বছরের কথা তোমরা জানবে। আদিম

মানুষ ততদিনে সভ্য মানুষ হয়ে গেছে। তার মধ্যে বদলে গেছে কতকিছু। সেইসব বদলে যাওয়ার কথা তোমরা জানবে। দেখবে কেমনভাবে টুকরো জোড়া দিয়ে পুরোনো দিনের কথা জানতে পারা যায়। এবারে তাহলে টুকরোগুলো খোঁজার ও জোড়ার কাজ শুরু হোক। এই পুরো ইতিহাস বইটাই তো যেন বিরাট একটা *জিগ-স পাজল*!

পড়ার মাঝে মজার কাজ

একটা পিচবোর্ড নিয়ে তার উপরে সাদা কাগজ লাগাও। কাগজের উপরে নিজেদের পছন্দমতো একটা ছবি আঁকো। অসমান কয়েকটা টুকরো করে কেটে ফেলো ছবিটা। তারপর সবাই মিলে টুকরোগুলো সাজিয়ে গোটা ছবিটা বানাও। হয়ে গেলো তোমাদের জিগ-স পাজল!

টুকরো কথা

পুরোনো দিনের কথা গুছিয়ে লেখা থাকলে সহজেই জানা যেত পুরোনো সময়ের কথা। কিন্তু, প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস তেমন সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা ছিল না। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা নানাভাবে সেই ইতিহাস জানার চেষ্টাই করেন। হরেক উপাদানের টুকরো জুড়ে জুড়ে একটা গোটা ছবি তৈরি করেন। তবুও পুরোনো দিনের সব লেখা আজও পড়ে ওঠা যায়নি। তাই ঐ লেখাগুলো থেকে পুরোনো সময়ের ইতিহাস জানা যায় না। যেমন, হরপ্পার লিপি আজও পড়া যায়নি। মাটি খুঁড়ে পাওয়া নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানই হরপ্পার ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। একটা বড়ো অঞ্চল জুড়ে অনেক সময় প্রত্নতাত্ত্বিকরা খোঁড়ার কাজ চালান। ওই অঞ্চলটাকে প্রত্নক্ষেত্র বলা হয়। তেমনি প্রত্নক্ষেত্র থেকে নানারকম প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। কখনও ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরের চিহ্ন। কখনও বা নানা পাত্র, সিলমোহর, মূর্তি। আবার মাটির পাত্রের গায়ে লেগে থাকা শস্যের দানা বা খোসা। কখনও মানুষ ও পশুর হাড়গোড়, কঙ্কাল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে প্রত্নবস্তুগুলির গুরুত্ব বিরাট। তবে লিখিত ইতিহাস পাওয়া গেলেই প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রত্নবস্তুর পরীক্ষা থেকে যাচাই করা যায় লেখা ইতিহাস কতটা ঠিক।

প্রত্নবস্তুর পরেই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লেখমালা। প্রাচীনকালে পাথর বা ধাতুর পাতে লিপি খোদাই করে লেখা হতো। সেই লেখাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। পাথরের গায়ে খোদাই লেখাগুলিকে *শিলা (পাথর) লেখ* বলা হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের লেখগুলি লেখমালার শ্রেষ্ঠ নমুনা। আবার অনেক শাসকের গুণগানও লেখ হিসাবে খোদাই করা হতো। সেগুলোকে বলে *প্রশস্তি*। প্রশস্তি মানে গুণগান করা। এই প্রশস্তি লেখগুলি থেকেও ঐ শাসকের বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন, গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি। আর লেখমালাগুলিতে নানা অব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তার থেকে ইতিহাসের 'কবে'-র অনেক কিছু জানা যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার জন্য মুদ্রা কাজে লাগে। মুদ্রায় শাসকের নাম, মূর্তি প্রভৃতি খোদাই করা থাকে। অব্দও পাওয়া যায় মুদ্রায়। এর ফলে মুদ্রা থেকে নানারকম তথ্য জানতে পারা যায়। শক-কুষাণদের ইতিহাস তো তাদের মুদ্রা থেকেই জানা যায়।

প্রাচীন ভারতের নানা শিল্পবস্তু থেকেও ইতিহাসের নানা কিছু জানা যায়। এই শিল্পবস্তু সাধারণভাবে তিনরকমের। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। পাথর, ধাতু ও পোড়ামাটির উপরে খোদাই করে নানা কিছু বানানো হতো। যেমন দেব-দেবী, মানুষ ও পশুর মূর্তি। এগুলোই ভাস্কর্য। মন্দির বা প্রাসাদের দেয়ালেও ভাস্কর্য খোদাই থেকে অনেক বিষয় জানা যায়। তবে প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের নমুনা যথেষ্ট পাওয়া যায় না। ভীমবেটকা ও অজন্তার মতো গুহার দেয়ালগুলোতে আঁকা ছবিগুলি যদিও আজও রয়েছে। সেখানে ছবির বিষয় হিসাবে শাসক ও সাধারণ মানুষের জীবনের নানাদিক ফুটে উঠেছে। প্রাচীন সমাজ ও জীবন বোঝবার জন্য সেগুলি খুব জরুরি। আবার স্থাপত্যের নানা নমুনা থেকেও পুরোনো দিনের কথা জানা যায়। বাড়িঘর, প্রাসাদ, মন্দির এসবই স্থাপত্যের উদাহরণ।

ইতিহাসের উপাদান

সবসময় ছবিগুলো পুরোপুরি তৈরি হয় না। কারণ উপাদানে ফাঁক থেকে যায়। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে মূল ছ-টি ভাগে ভাগ করা যায়। তার প্রতিটির মধ্যে আবার নানা ভাগ আছে। নীচের তালিকা-চাকাটি খেয়াল করো।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ক্ষেত্রে অনুমানের উপরে অনেকটা নির্ভর করতে হয়। লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরোটা অনুমান করতে হয় না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে অনেকরকম সাহিত্য উপাদান পাওয়া যায়। সেগুলোকে মোটামুটি দু-রকম ভাগ করা যায়। দেশি ও বিদেশি লেখকদের রচনা। দেশীয় সাহিত্যকে আবার ধর্মভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যে ভাগ করা যায়। ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের মধ্যে প্রধান হলো বৈদিক সাহিত্য। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সময়ের ইতিহাস জানতে বৈদিক সাহিত্যগুলিই মূল উপাদান। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে মহাকাব্য ও পুরাণগুলির গুরুত্ব আছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের নানা লেখাতেও প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথা আছে। বিশেষত, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ইতিহাস জানার জন্য এই লেখাগুলি খুবই জরুরি।

প্রাচীন ভারতের
সাহিত্য উপাদান
দেশি
ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য
ধর্মভিত্তিক সাহিত্য
বিদেশি
গ্রিক বিবরণ
রোমান বিবরণ
চিনা বিবরণ

ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা নানা বই থেকেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। রাজনীতি, ব্যাকরণ, বিজ্ঞানের বইতেও সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির নানা কথা রয়েছে। পাশাপাশি কাব্য, নাটক, অভিধান, চিকিৎসাবিষয়ক বইতেও ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। বেশ কিছু জীবনীমূলক লেখাপত্রও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। বাণভট্টের *হর্ষচরিত* এমন লেখার একটি প্রধান উদাহরণ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার জন্য তিনধরনের বিদেশি বিবরণ খুব জরুরি। গ্রিক, রোমান ও চিনা দূত ও পর্যটকদের বিবরণ। তবে, বিদেশি সাহিত্যগুলির কয়েকটি সমস্যা আছে। বিদেশিরা ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি বুঝতেন না। ফলে অনেক কিছুর মানে বুঝতে তাদের ভুল হয়েছিল। তাছাড়া অনেক লেখার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেশীয় সাহিত্যেও পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ আছে। তাছাড়া, কাব্য-নাটকে সমাজের নীচু তলার মানুষের কথা বিশেষ জানা যায় না। অধিকাংশ সাহিত্যের বর্ণনা মনগড়া। তবুও প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস জানার জন্য সাহিত্য উপাদানগুলোর গুরুত্ব রয়েছে।

২ ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ

যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপন

স্কুল থেকে দল বেঁধে একদিন চিড়িয়াখানায় যাওয়া হলো। সঙ্গে দিদিমণি ও মাস্টারমশায়রাও ছিলেন। শিম্পাঞ্জি দেখে তিতির বলে উঠল, জানিস মানুষ আগে শিম্পাঞ্জির মতোই ছিল! আনোয়ার বলল, শিম্পাঞ্জি তো জন্তু, গায়ে বড়ো বড়ো লোম। তাছাড়া শিম্পাঞ্জি ভালোভাবে দাঁড়াতেই পারে না। সিধু বলল, চল, আমরা সবাই দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করি। অরুণ বলল, দিদি, মানুষ কি সত্যি এক সময় শিম্পাঞ্জির মতো ছিল? দিদিমণি বললেন, আজ চিড়িয়াখানা ভালো করে ঘুরে দেখো। কাল ক্লাসে আমরা এবিষয়ে কথা বলব।

২.১ আদিম মানুষের কথা

মানুষ ও তার কাজকর্ম নিয়েই মানুষের ইতিহাস। মানুষ আবার একটি বিশেষ প্রাণীও। শরীরের নির্দিষ্ট কতগুলি বৈশিষ্ট্য থেকেই আলাদা করে মানুষকে চেনা যায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানান বদলের মধ্যে দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি তৈরি হয়েছে। দু-পায়ে হাঁটা, হাতের ব্যবহার, লম্বা মেরুদণ্ড— এই সবই মানুষের বৈশিষ্ট্য। আর তার মেরুদণ্ডের উপরে রয়েছে একটি বড়ো মস্তিষ্ক।

মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা হাতের বুড়ো আঙুলকে কোনো কিছু ধরতে ব্যবহার করে। তাছাড়া মানুষের মাথার খুলি বড়ো মস্তিষ্ক ধরে রাখতে পারে। কয়েক লক্ষ বছর ধরে এইসব বদলগুলো মানুষের শরীরে হয়েছিল।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর স্থলভাগ ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব অংশেও তেমনি ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বিশাল আকারের ভয়ানক সব প্রাণী। গাছে গাছে ছিল নানা ধরনের অনেক পাখি আর বানর। সেখানে এক ধরনের বড়ো বানর ছিল। তাদের লেজ ছিল না। এদের *এপ* (Ape) বলা হয়। অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে আবহাওয়া বদলাতে থাকল। নানা কারণে গাছপালা আগের থেকে কমে গেল। গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো কঠিন হয়ে গেল। তাছাড়া আগের মতো সহজে ফলমূল পাওয়াও মুশকিল হয়ে গেল। তখন এপদের একদল গভীর জঙ্গলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

অন্য দলটি খাবার খুঁজতে গাছ থেকে মাটিতে নেমে এল। দু-পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। খাবার সহজে পাওয়া গেল না। তাই খাবার খোঁজা শুরু হলো। এরপর এল কোনোভাবে দাঁড়াতে পারা মানুষ। সে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগের কথা। এইভাবে আস্তে আস্তে এপ থেকে আলাদা হয়ে গেল মানুষ পরিবার বা হোমিনিড। শুরু হলো মানুষের এগিয়ে চলা এবং নিজেকে উন্নত করা।
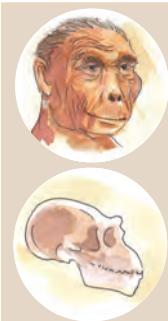
টুকরো কথা
আদিম মানুষের নানারকম

আদিম কথার মানে খুব পুরোনো বা গোড়ার দিকের। খুব পুরোনো সময়ের মানুষ বোঝাতে আদিম মানুষ কথাটা ব্যবহার করা হয়। এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে পুরোনো আদিম মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে পূর্ব আফ্রিকাতে। আদিম মানুষের মধ্যেও নানারকম ভাগ রয়েছে। মূলত মস্তিষ্কের আকার থেকেই সেই ভাগাভাগি করা হয়।
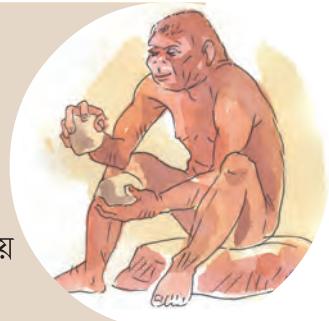
অস্ট্রালোপিথেকাস : এপ থেকে মানুষ

- এরা ছিল আনুমানিক ৪০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে।
- এরা দু-পায়ে ভর দিয়ে কোনোক্রমে দাঁড়াতে পারত।
- শক্ত বাদাম, শুকনো ফল চিবিয়ে খেত। চোয়ালে ছিল শক্ত ও সুগঠিত।
- এরা গাছে ডাল দিয়ে ধাক্কা মারত, পাথর ছুঁড়তে চেষ্টা করত।

হোমো হাবিলিস : দক্ষ মানুষ

- এরা ছিল আনুমানিক ২৬ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগে।
- এরা দলবদ্ধভাবে থাকত। হাঁটতে পারত।
- ফলমূলের পাশাপাশি এরা সম্ভবত কাঁচা মাংস খেত।
- এরাই প্রথম পাথরকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে একটা পাথর দিয়ে আরেকটা পাথরকে জোরে আঘাত করে পাথরের অস্ত্র বানাত।

হোমো ইরেকটাস : সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা মানুষ

- এরা ছিল আনুমানিক ২০ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বছর আগে।
- এরা দু-পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াত। দলবদ্ধভাবে গুহায় থাকত।
- এরা শিকার করতে পারত। এরাই প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল।
- এরা বানিয়েছিল স্তরকাটা নুড়ি পাথরের হাতিয়ার। শেষ দিকে বানিয়েছিল হাতকুঠার।

হোমো স্যাপিয়েন্স : বুদ্ধিমান মানুষ

- এরা আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগে এসেছিল।
- এরা দল বেঁধে বড়ো পশু শিকার করত। নানা কাজে আগুন ব্যবহার করত। পশুর মাংস পুড়িয়ে খেত। পশুর চামড়া পরত।
- ছোটো, তীক্ষ্ণ ও ধারালো পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল। এরা বর্শা জাতীয় পাথরের অস্ত্র বানাতে পারত।
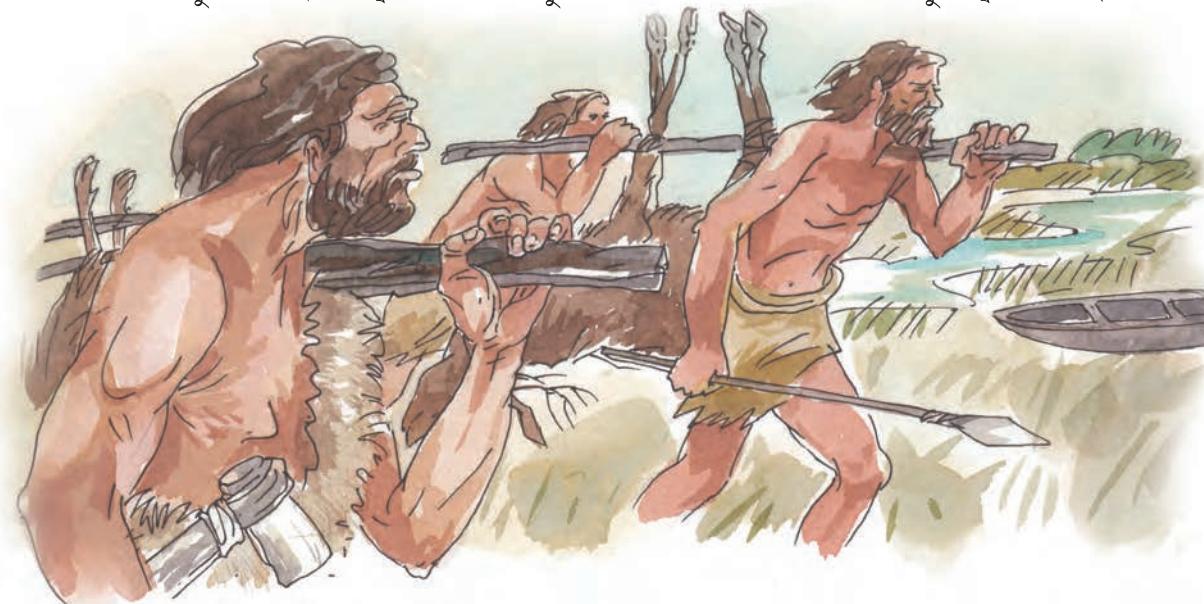
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আদিম মানুষ পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানাত। সেজন্য *পাথরের যুগ* মানুষের ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ। পাথরের যুগকে সাধারণভাবে তিনটে পর্যায়ে ভাগ করা হয়। সেই প্রতিটা ভাগে পাথরের হাতিয়ারগুলির আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাছাড়া আদিম মানুষের জীবনযাপনেও অনেক বদল ঘটেছিল।

তালিকা ২.১: এক নজরে তিনটি পাথরের যুগ

পুরোনো পাথরের যুগ	মাঝের পাথরের যুগ	নতুন পাথরের যুগ
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০ লক্ষ বছর থেকে খ্রিস্ট পূর্ব ১০ হাজার বছর।	আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০ হাজার থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮ হাজার বছর।	আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮ হাজার থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪ হাজার বছর।
হাতিয়ার বড়ো ও ভারী পাথরের, এবড়োখেবড়ো। শিকার করে ও বনের ফলমূল জোগাড় করে খেত।	হাতিয়ারের পাথর ছোটো হালকা ও ধারালো। শিকার করে ও বনের ফলমূল জোগাড় করার পাশাপাশি পশুপালন শুরু হয়।	হাতিয়ার অনেক হালকা ও ধারালো। নানারকমের হাতিয়ার পশুপালন ও কৃষিকাজ শুরু হয়। মাটির পাত্র বানানো শুরু।
খোলা আকাশের নীচে কখনও বা গুহায় থাকত।	গুহা থেকে বেরিয়ে ছোটো ছোটো বসতি বানানো শুরু।	যাযাবর জীবন ছেড়ে একটা অঞ্চলে স্থায়ী বসতি বানানো।

আগুন ব্যবহার করতে শেখা মানুষের ইতিহাসে খুব জরুরি একটা বিষয়। অন্য সব প্রাণী আগুনকে ভয় পায়। প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একমাত্র আগুন জ্বালাতে ও ব্যবহার করতে পারে। প্রথমদিকে বনে লাগা আগুন (*দাবানল*) বা অন্যভাবে জ্বলে ওঠা আগুন তারা দেখত। পরে হয়তো কোনো একসময়ে জ্বলন্ত গাছের ডাল এনে গুহার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে রাখত। নিভতে দিত না। এরপর হঠাৎ একদিন আদিম মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। হয়তো পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে গিয়ে চকমকি জাতীয় পাথরের ঠোকাঠুকিতে হঠাৎ জ্বলে ওঠে আগুন। অথবা কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালিয়ে ছিল।

আগুনের ব্যবহার করার ফলে বেশ কিছু বদল দেখা যেতে থাকে। একদিকে প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাত আগুন। পাশাপাশি বিভিন্ন জন্তুর আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যেও আগুনের ব্যবহার শুরু হয়। তাছাড়া আগুনের ব্যবহার আদিম মানুষের খাবার অভ্যাসও বদলে দিয়েছিল। এসময় কাঁচা খাওয়ার বদলে খাবার আগুনে ঝলসে খাওয়া শুরু হয়। ঝলসানো নরম মাংস খেতে তাদের চোয়াল ও দাঁতের জোর কম লাগত। তাই ধীরে ধীরে তাদের চোয়াল সরু হয়ে এল। সামনের ধারালো উঁচু দাঁত ছোটো হয়ে গেল। আরও নানারকম বদল হলো চেহারায়। আদিম মানুষের শরীরে জোর বাড়ল, বুদ্ধিরও বিকাশ হলো।

২.২ ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ : হাতিয়ার ও জীবনযাপনের নানা দিক

আফ্রিকা, চিন ও জাভায় খুব পুরোনো মানুষের কঙ্কাল ও হাড়গোড়ের খোঁজ পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে তত পুরোনো মানুষের নজির নেই। সম্ভবত আফ্রিকা থেকে আদিম মানুষ একসময় ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। আদিম মানুষের হাড়গোড়ের অল্প নমুনাই উপমহাদেশে পাওয়া যায়। বরং তাদের ব্যবহার করা পুরোনো হাতিয়ার বেশ কিছু অঞ্চলে পাওয়া গেছে। সেগুলো থেকেই উপমহাদেশে আদিম মানুষের কথা জানতে পারা যায়।

২.২.১ উপমহাদেশে পুরোনো পাথরের যুগ

ভারতীয় উপমহাদেশের সব থেকে পুরোনো পাথরের অস্ত্র পাওয়া গেছে কাশ্মীরের সোয়ান উপত্যকায়। তাছাড়া পাকিস্তানের পটোয়ার মালভূমিতে ও হিমাচল প্রদেশের শিবালিক পর্বত অঞ্চলেও পুরোনো পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। ঐ হাতিয়ারগুলি বেশির ভাগই হাত কুঠার ও চপার জাতীয়। হাতিয়ারগুলি বেশিরভাগ ছিল ভারী নুড়ি পাথরের তৈরি ।

হোমো ইরেকটাস প্রজাতির আদিম মানুষ উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কর্ণাটকের হুন্সগি উপত্যকা, রাজস্থানের দিদওয়ানা ও মহারাষ্ট্রের নেভাসাতে তার প্রমাণ রয়েছে। এইসব প্রত্নকেন্দ্রগুলিতে নানারকম পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রদেশের নর্মদা উপত্যকায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার বছরেরও বেশি আগের মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে।

ভারী নিরেট পাথরের হাত কুঠার যারা ব্যবহার করত তারা খাবার জোগাড় করত। নিজেদের খাবার তারা নিজেরা বানাতে পারত না। পশুপালনও তাদের

টুকরো কথা

লুসি

আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়ায় হাদার (Hadar) নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে একটা অস্ট্রালোপিথেকাসের কঙ্কালের কিছু অংশ পাওয়া গেছে। কঙ্কালটি প্রায় ৩২ লক্ষ বছর আগের একটি ছোটো মেয়ের। কঙ্কালটির নাম দেওয়া হয়েছিল লুসি। লুসির মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বেশ বড়ো ছিল। যদিও ধীরে ধীরে আদিম মানুষের মস্তিষ্ক আরও বড়ো হতে থাকে।

ছবি.২.১: লুসির হাড়গোড়

জানা ছিল না। শিকার করে ও ফলমূল জোগাড় করেই তারা পেট ভরাত। ফলে নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে দিন কাটত তাদের। সেই যাযাবর জীবনে পাকাপাকি একটি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলেনি আদিম মানুষ। কিছু সময় থাকার জন্য তারা বেছে নিত কোনো প্রাকৃতিক গুহা। তা না পেলে খোলা আকাশের নীচেই দিন কাটত। *পুরোনো পাথরের যুগে* আদিম মানুষের জীবন ছিল বেশ কঠিন ও কষ্টের। দলবেঁধে তারা পশু শিকার করত। মিলেমিশে খাবার ভাগ করে খেত। প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে বাঁচতে পশুর চামড়া, গাছের ছাল পরত। আদিম মানুষ তখনও পোশাক তৈরি করতে শেখেনি। উপমহাদেশের কয়েকটি অংশে তেমন পুরোনো গুহা-বসতির নজির রয়েছে। যেমন, উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের সাংঘাও, কর্ণাটকের কুর্ণুল ও মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা।

টুকরো কথা
ভীমবেটকা

ছবি. ২.২ : ভীমবেটকার গুহায় আঁকা ছবি

মধ্যপ্রদেশের ভূপাল থেকে কিছুটা দূরে, বিন্ধ্যপর্বতের গা ঘেঁষে নির্জন জঙ্গল। সেখানে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, ভীমবেটকায় বেশ কিছু গুহার খোঁজ পাওয়া যায়। ঐ গুহাগুলিতে পুরাতন পাথরের যুগ থেকে আদিম মানুষেরা থাকতে শুরু করে। গুহার দেয়ালে তাদের আঁকা ছবি পাওয়া গেছে। প্রায় সবই শিকারের দৃশ্য। নানারকম বন্য পশুর ছবি রয়েছে। তাছাড়া পাখি, মাছ, কাঠবেড়ালির মতো প্রাণীর ছবিও দেখা যায়। এছাড়া দেখা যায় মানুষ একা অথবা দলবেঁধে শিকার করছে। তাদের কারো কারো মুখে মুখোশ। হাতে-পায়ে গয়না। অনেক সময়ই মানুষের সঙ্গে কুকুরকে দেখা যায়। ছবিগুলিতে সবুজ ও হলুদ রং-এর ব্যবহার হলেও বেশি দেখা যায় সাদা এবং লাল রং।
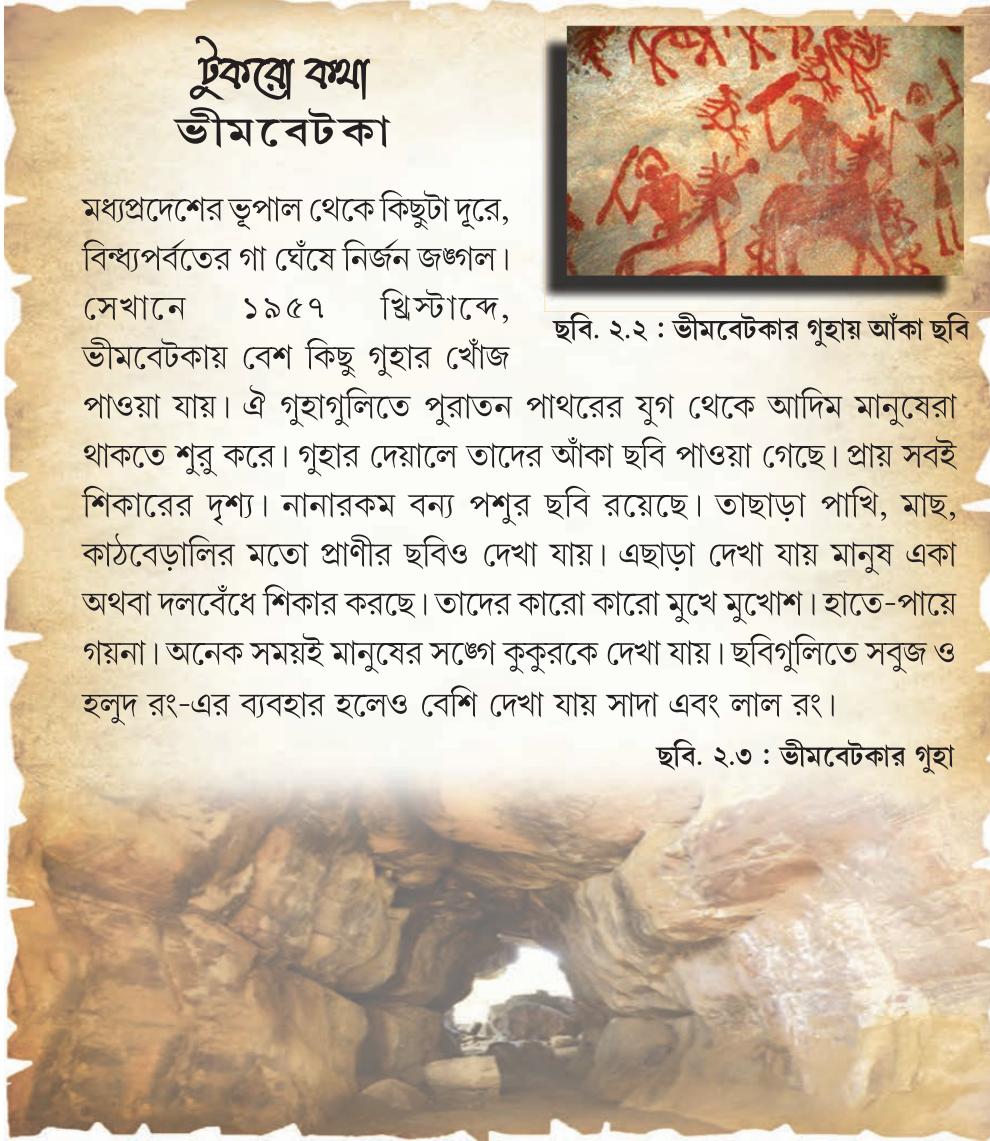
ছবি. ২.৩ : ভীমবেটকার গুহা

টুকরো কথা
হুন্সগি উপত্যকা

কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলার উত্তর-পশ্চিমে হুন্সগি উপত্যকায় ইসামপুর গ্রাম। তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাথটা হাল্লা খাল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মাটি খুঁড়ে সেখানে পুরোনো পাথরের যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। ঐগুলি আজ থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ বছর আগেকার। এর বেশির ভাগই হাত-কুড়ুল, ছোরা, চাঁছুনি জাতীয়। অনেকের মতে হুন্সগিতে পাথরের হাতিয়ার তৈরি হতো। খালের জল, নানারকম বন্যজন্তু ও গাছপালা ঐ অঞ্চলে ছিল। সম্ভবত সেজন্য ঐ জায়গাটা বেছে নিয়েছিল আদিম মানুষ।

টুকরো কথা
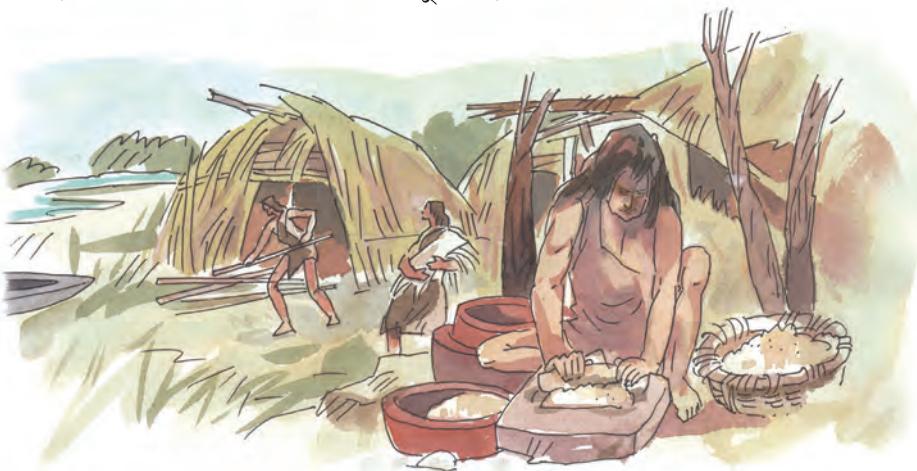
ট্যরো - ট্যরো

ইউরোপের স্পেনে একটি পাহাড়ি এলাকা হলো আলতামিরা। সেখানে কয়েকটি প্রাচীন গুহার খোঁজ পাওয়া যায়। এক প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁর ছোটো মেয়েকে নিয়ে গুহাগুলি দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটা আলো। হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল **ট্যরো - ট্যরো** অর্থাৎ ষাঁড়-ষাঁড়। দেখা গেল গুহার ছাদে বিশাল বড়ো একটি ষাঁড়ের ছবি। প্রায় ৫০ থেকে ৩০ হাজার বছর আগেকার গুহাবাসী মানুষের আঁকা।

পাথরের হাতিয়ার তৈরির পদ্ধতি খুব ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল। হাতিয়ারগুলি আস্তে আস্তে হালকা, ছোটো ও ধারালো হয়ে উঠছিল। একটা বড়ো পাথরের গায়ে আঘাত করে তার কোনাচে অংশগুলো বার করা হতো। সেই হালকা ও ছোটো কোনাচে অংশগুলো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তার ফলে ভারী নুড়ি পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহার কমতে থাকে। **পাথরের হাতিয়ার বানানো কৌশলের এই তফাত দিয়েই পুরোনো পাথরের যুগের বিভিন্ন পর্বকে আলাদা করা হয়।** পুরোনো পাথরের যুগের এই মাঝের পর্বে ছুরি ছিল একটি প্রধান হাতিয়ার। পুরোনো পাথরের যুগের শেষ পর্ব পর্যন্ত ঐ জাতীয় ছুরির ব্যবহার হতো।

২.২.২ উপমহাদেশের মাঝের পাথরের যুগ

এরপর *মাঝের পাথরের যুগে* আরও উন্নত হাতিয়ার বানানো হতে থাকে। এই সময় ছুরিগুলো আগের থেকে অনেক বেশি ধারালো ও ছোটো হয়ে গেছিল। তাই সেগুলোকে ছোটো পাথরের হাতিয়ার বলা হয়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার অব্দ নাগাদ উপমহাদেশের আবহাওয়া গরম হতে শুরু করে। ফলে আগের থেকে গরম আবহাওয়া মানুষের থাকার জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করেছিল। মাঝের পাথরের যুগের ছোটো হাতিয়ারগুলি গাছের ডালের সঙ্গে জুড়ে বা গেঁথে নেওয়া হতো। তার ফলে হাতিয়ার ধরতে সুবিধা হতো। উত্তরপ্রদেশের মহাদহা, মধ্যপ্রদেশের আদমগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ যুগের মানুষের হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

উত্তরপ্রদেশের সরাই নহর রাইতে দু-দিকে ধারওলা ছুরি পাওয়া গেছে। তাছাড়া হাড়ের তৈরি তিরের ফলাও দেখা গেছে। বিভিন্নরকম বন্য পশুর হাড় সেখানে রয়েছে। পশুর মাংস ঝলসানোর জন্য আগুনের ব্যবহার করা হতো। ভেড়া বা ছাগল জাতীয় কোনো পশুর হাড় পাওয়া যায়নি। তার থেকে মনে হয়
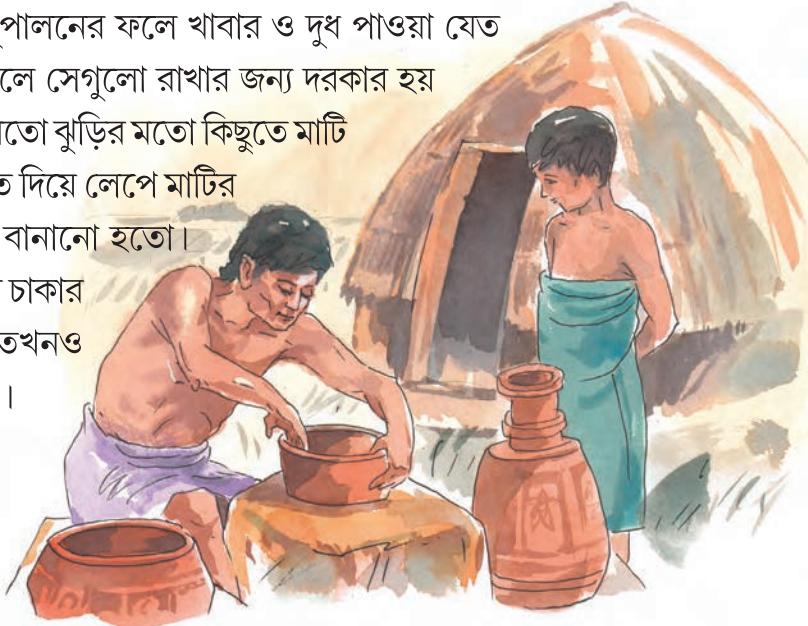
আদিম মানুষ তখনও শিকারি ছিল। সরাই নহর রাইতে জাঁতার মতো যন্ত্র দেখা গেছে। শস্যদানা গুঁড়ো করতে ওই জাঁতা ব্যবহার হতো। তবে সরাই নহর রাইয়ের মানুষ বনের শস্য এনে জাঁতায় পিষে নিত। তারা কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারত না। ঐ প্রত্নক্ষেত্রে আদিম মানুষের সমাধি ও কঙ্কাল পাওয়া গেছে। মহাদহাতেও সমাধি পাওয়া গেছে। সেখানের কঙ্কালগুলি থেকে জানা যায় কম বয়সেই সেই মানুষগুলি মারা গিয়েছিল।

নর্মদা উপত্যকার আদমগড়ে আট হাজার বছর পুরোনো বন্য পশুর হাড় পাওয়া গেছে। পাশাপাশি বেশ কিছু গবাদি পশু ও কুকুরের হাড়ও রয়েছে। গবাদি পশু ও কুকুরের হাড়ে আঘাতের চিহ্ন নেই। অর্থাৎ তাদের মারা হয়নি। এর থেকে মনে হয় আদমগড়ের মানুষ পশুপালন করতে শিখেছিল। তবে তারাও শিকার করেই খাবার জোগাড় করত।

পশুপালনের ফলে খাবার ও দুধ পাওয়া যেত বেশি। ফলে সেগুলো রাখার জন্য দরকার হয় পাত্র। হয়তো ঝুড়ির মতো কিছুতে মাটি ঢেলে হাত দিয়ে লেপে মাটির পাত্রগুলি বানানো হতো। কুমোরের চাকার ব্যবহার তখনও শুরু হয়নি।

টুকরো কথা

বাগোড়

রাজস্থানের বাগোড়ে আদিম মানুষের বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। একেবারে প্রথমদিকে বাগোড়ের বাসিন্দারা শিকার করেই খাবার জোটাত। কিছু কিছু পশুপালনও তাদের জানা ছিল। বাগোড়ে অনেকগুলি পশুর হাড় পাওয়া গেছে। সেগুলো থেকে অনুমান করা হয় পরের দিকে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বেড়েছিল। পাশাপাশি কমতে থাকে শিকার করা পশুর সংখ্যা। অর্থাৎ বাগোড়ের মানুষ ধীরে ধীরে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। সেভাবে দেখলে বাগোড়ে শিকার ও পশুপালন দুই-ই চলত।

২.২.৩ উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগ

আদিম মানুষের ইতিহাসে *নতুন পাথরের যুগ* অনেকদিক থেকেই নতুন ছিল। পাথরের হাতিয়ার বানানোর কৌশল অনেক উন্নত হয়েছিল। নানান রকম পাথরের হাতিয়ার তৈরি করা শুরু হয়। পাশাপাশি ছোটো পাথরের হাতিয়ারও এসময় ব্যবহার করা হতো। এই পর্যায়ে প্রথম আদিম মানুষ কৃষিকাজ শেখে। ফলে তারা নিজেরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন শুরু করে। নতুন পাথরের যুগে শিকার করতে বা পশু চরাতে ছেলেরা দল বেঁধে যেত। মেয়েরা বাচ্চাদের

দেখাশোনা করত। ফলমূল জোগাড় করত। এইভাবে একসময়ে গাছপালা দেখতে দেখতে মেয়েরা বুঝতে পারল কীভাবে বীজ থেকে চারাগাছ হয়, চারাগাছ থেকে বড়োগাছ। তখন শুধু খাবার খোঁজা নয়, খাবার তৈরি করতে পারল তারা। মানুষ শিখল কৃষিকাজ। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার ফলে কৃষি অঞ্চলেই স্থায়ী বসতি বানিয়ে থাকতে শুরু করে মানুষ। চাষের সঙ্গে যুক্ত হয় *বাস* বা থাকা। *চাষবাস* কথাটা আজও ব্যবহার হয়। তার থেকে ক্ষেতের পাশে বসতি বানানোর গুরুত্ব বোঝা যায়। শিকার ও পশুপালনের জন্য মানুষকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো। কৃষিকাজ শুরু করার পরে সেই ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়। তাছাড়া কৃষিকাজ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। শিকারের মতো তা অনিশ্চিত নয়। ফলে *যাযাবর* মানুষ ধীরে ধীরে কৃষি ও স্থায়ী বসতির দিকে যেতে থাকে। চাষ করার ফলে পশুপালনও সহজ হয়ে গেল। অঢেল খড়, বিচালি। গবাদি পশুর সংখ্যা বেড়ে গেল।

শিকার ও পশুপালন করে যা পাওয়া যেত, তা গোষ্ঠীর সবাই ভাগ করে নিত। তাই সেই সমাজে ভেদাভেদ বিশেষ ছিল না। তুলনায় কৃষি সমাজ অনেক বেশি জটিল। সেই সমাজে জমি ও ফসলের সমান ভাগাভাগি ছিল না। পাশাপাশি কৃষিতে বাড়তি ফসল ফলানো যেত। তাই সবাইকে নিজেদের পেট ভরানোর জন্য নিজেদের চাষ করতে হতো না। ফলে কৃষির বদলে অনেকেই কারিগর বা অন্যান্য কাজ করতে থাকে। চাষের কাজে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতো। পাথর ও কাঠ দিয়ে সেগুলো বানাত কারিগরেরা। ফলে ক্রমশ আদিম মানুষের সমাজ থেকে জটিল ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা দেখা দেয়।

এবারে ভেবে দেখো মানুষের চেয়ে অনেক প্রাণীর শক্তি অনেক বেশি। অথচ সেই শক্তিশালী প্রাণীরা অনেকেই একসময়ে হারিয়ে গেছে। তোমরা তো ডাইনোসোরের কথা জেনেছ। কিন্তু মানুষ আজও টিকে আছে। অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষ উন্নতিও করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই টিকে থাকা ও উন্নতি করা সম্ভব হলো কীভাবে? তার জন্য অনেকটা দায়ী মানুষের *সংস্কৃতি*। সংস্কৃতি বলতে এমনিতে নাচ-গান, পোশাক, শিল্প-সাহিত্য বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃতি কথাটার

ছবি. ২.৪: বিভিন্ন পাথরের যুগে আদিম মানুষের হাতিয়ার

আরেকটা দিক রয়েছে। খাওয়া, ঘুম এসব মানুষের শরীরের দরকার হয়। তার বাইরে নানান কাজকর্ম করে মানুষ। সেইসব কাজকর্মও কিন্তু মানুষের সংস্কৃতির অংশ। সেভাবে বললে **আদিম মানুষেরও সংস্কৃতি ছিল**। পাথরের ভোঁতা হাতিয়ার বানানোও সেই সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে। **সংস্কৃতির জন্যই যে-কোনো পরিবেশে মানুষ নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছে**। শীত, বর্ষা ও গরম সব অবস্থাতেই টিকে থাকতে শিখেছে মানুষ। প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে মানুষ। সেই ব্যবহার করার পদ্ধতিগুলোও মানুষের সংস্কৃতির ভেতরে পড়ে। বলা যেতে পারে, সবসময় সব সমাজেরই কোনো না কোনো সংস্কৃতি ছিল।

যেমন ধরো, একসময় পৃথিবীতে খুব ঠান্ডা ছিল। অনেক পশু-পাখির মতো মানুষেরও সেই ঠান্ডায় কষ্ট হতো। এক সময় ঠান্ডা থেকে বাঁচতে মানুষ গাছের ছাল গায়ে জড়াতে শুরু করল। কখনওবা মরা পশুর চামড়াও পরত। এই যে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ছাল-চামড়া দিয়ে গা ঢাকার উপায় বের করল মানুষ, সেটাই সংস্কৃতির অংশ।

তবে, **সংস্কৃতি থেকে সভ্যতা আলাদা**। ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগে স্থায়ী বসতি দেখা গেল। তার সঙ্গে ধীরে ধীরে সভ্যতার নানা বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠলো মানুষের জীবনযাত্রায়। আদিম মানুষের ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের দিকে যেতে থাকল।

মানচিত্র ২.১ : ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষের প্রথম বসতি

???

ভেবে দেখো

পুরোনো পাথরের যুগ থেকে নতুন পাথরের যুগ পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রায় কোন কোন বিষয়গুলি জরুরি হয়ে উঠেছিল? তার একটা ছবিসহ তালিকা বানাও।

মানচিত্র ২.২ : ভারতীয় উপমহাদেশে মাঝের পাথরের যুগের বসতি

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

১.১) আদিম মানুষ প্রথমে — (রান্না করা খাবার/পোড়া মাংস/কাঁচামাংস ও ফলমূল) খেত।

১.২) আদিম মানুষের প্রথম হাতিয়ার ছিল— (ভোঁতা পাথর/ হালকা ছুঁচালো পাথর/ পাথরের কুঠার)।

১.৩) আদিম মানুষের জীবনে প্রথম জরুরি আবিষ্কার— (ধাতু/ চাকা/ আগুন)।

২। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :
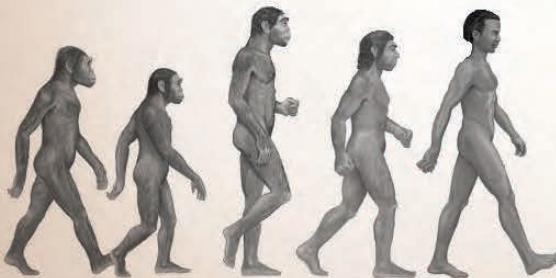
ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
কৃষিকাজ	মধ্যপ্রদেশ
পশুপালন	নতুন পাথরের যুগ
ভীমবেটকা	মাঝের পাথরের যুগে
হুন্সগি	কর্ণাটক

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৩.১) আদিম মানুষ যাযাবর ছিল কেন?

৩.২) আগুনে জ্বালাতে শেখার পর আদিম মানুষের কী কী সুবিধা হয়েছিল?

৩.৩) আদিম মানুষ কেন জোট বেঁধেছিল? এর ফলে তার কী লাভ হয়েছিল?

৪। হাতেকলমে করো :

৪.১) পাশের ছবিটিতে মানুষের প্রতিটি ধাপের মধ্যে কী কী বদল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

৪.২) পাশের ছবিদুটি থেকে আদিম মানুষের পাথরের হাতিয়ার বানানোর পদ্ধতি বিষয়ে কী জানা যাচ্ছে?

৩

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা

প্রথম পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-১৫০০ অব্দ

ইতিহাসে কি তাহলে শুধু পাথরের কথাই থাকে? রিনির একদম ভালো লাগে না। খালি নানারকম পাথরের হাতিয়ারের কথা। রুবির দাদু একদিন বললেন, পাথর নিয়ে এত চিন্তা কীসের? পাথরেওতো লেখা থাকে ইতিহাসের কথাই। তবে পাথুরে ইতিহাসই সব নয়। তার সঙ্গে মিশে আছে মানুষের জীবনও। সবাই এবারে জমিয়ে বসল। দাদু আবার ইতিহাসের গল্প শুরু করলেন।

খাবারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষ একসময় স্থায়ীভাবে বাস করতে শিখল। নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে শিখল। শুরু করল কৃষিকাজ। তার পাশাপাশি পশুপালনও করতে লাগল। পাথরের যুগের শেষদিকে স্থায়ী বসতবাড়ি, কৃষিকাজ এবং পশুপালনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল মানুষের জীবনযাত্রা। এভাবেই কালে কালে বদলে গেল মানুষের জীবনযাপনের নানা দিক।

অবশ্য সেই বদল ঘটেছে মানুষের নিজের প্রয়োজনেই। নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রমের জোরে সেই বদল ঘটিয়েছে মানুষ। সেভাবেই একসময় *আদিম* মানুষ হয়ে উঠেছে *সভ্য*। তবে আদিম থেকে সভ্য হওয়ার পথে মানুষকে অনেক ধাপ পেরোতে হয়েছে। যেমন, নতুন পাথরের যুগে চাষের কাজে ব্যস্ত মানুষের দরকার হলো স্থায়ী বসতবাড়ি ও চাষের জমি। সেই সময় চাষের জমির পরিমাণ যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে জমির চাহিদা। যে যার মতো জঙ্গল সাফ করে চাষের জমি বার করে নিতে থাকে। যার যত জমি তার তত ফসল। এভাবেই শুরু হলো জমির জন্য লড়াই। জোট বেঁধে বাস করতে থাকা মানুষদের নিজেদের মধ্যে একসময় মতের অমিল দেখা দিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিয়ে তো চলা যায় না। তাই তারা নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে নিল। ঠিক হলো সবাই নিয়ম মেনে চলবে। এভাবেই সেসময় চালু হলো নিয়ম বা নিয়মের শাসন।

আস্তে আস্তে সভ্য মানুষের নানা জিনিসের চাহিদা বাড়ল। তাছাড়া প্রয়োজনমতো সব জিনিস কোনো একজন মানুষ তৈরি করতে পারে না। তাই প্রথমে শুরু হলো জিনিস দিয়ে জিনিস নেওয়া। এরপর এল সেকালের মুদ্রা। তার ফলে জিনিস কেনাবেচা করা সহজে হলো।

সেই পাথরের যুগ থেকে মানুষ জোট বাঁধতে শুরু করেছিল। পরে তৈরি করল সমাজ। সমাজে মানুষ নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সেখানে কাজের বিচারে তৈরি হলো মানুষের নানা ভাগ। একসময় মানুষ লিখতে শিখল। আর তার প্রয়োজনে এল *বর্ণ* বা *লিপি*। সেসময় মানুষ কেবল গ্রামেই নয়, নগরেও বাস করত। এভাবেই গ্রাম ও নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল *সভ্যতা*। আদিম মানুষের যুগ থেকে ইতিহাস এসে পড়ল সভ্যতার যুগে।

পরদিন ক্লাসে সবাই বুবির দাদুর গল্প করল। দিদিমণি শুনলেন। তারপরে বললেন, সংস্কৃতি থেকে সভ্যতা খানিকটা আলাদা। সব মানুষেরই কোনো না কোনো সংস্কৃতি থাকে। তা তোমরা আগেই জেনেছ। কিন্তু, সভ্যতার কথা এলে বিষয়টা আর একটু আলাদা হয়ে যায়। সভ্যতার কতগুলো দিক থাকে। সেইসব দিক মিলিয়ে তৈরি হয় একটা সভ্যতা। এবারে দিদিমণি বোর্ডে একটা ছবি আঁকলেন। সবাই মন দিয়ে সেটা দেখল।

দিদিমণি বললেন, মানুষ নিজের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতে শিখল। এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাসও শুরু করল। কিন্তু সভ্যতা হতে গেলে সেইসঙ্গে আরও কতগুলো বিষয়ও থাকতে হবে। গ্রাম ও নগর থাকতে হবে। শাসনব্যবস্থা থাকতে হবে। শিল্প ও স্থাপত্যের নমুনা সভ্যতার একটা বড়ো দিক। আর অবশ্যই লিপির ব্যবহার জানতে হবে সভ্য মানুষকে। লিপিমালার ব্যবহারই সভ্যতার সবথেকে বড়ো মাপকাঠি। সভ্যতা বলতে একদিকে জীবনযাপনের উন্নতি বোঝানো হয়। ধরো, যখন লিখতে শিখল মানুষ বা গুহার বদলে বানাতে শিখল পাকা বাড়ি। আবার পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার শিখল।

সভ্যতার নানা দিক
শাসন কাঠামো
শিল্প ও স্থাপত্য
লিপি
গ্রাম ও নগরের উদ্ভব

মনে রেখো

নতুন পাথরের যুগের শেষের দিকে চাকার ব্যবহার শুরু হয়।

এইসবই এক একটা উন্নতির চিহ্ন। এগুলো সবই সভ্যতার নানা দিক। আর এক একটা ভৌগোলিক অঞ্চলকে ঘিরে একেকটা সভ্যতা গড়ে উঠে। তাই মেহেরগড় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা এসব নামকরণ হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে নগর সভ্যতা গড়ে উঠল। আদিম গোষ্ঠী সমাজে সবার মধ্যে একটা সমতার ধারণা ছিল। নগর সভ্যতায় সেই সমতা আর থাকল না। শাসক গোষ্ঠী তৈরি হলো। যারা গোটা জনসমাজকে শাসন করত। আবার একদল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞ করত। এভাবেই সমাজে নানারকম ভেদাভেদ তৈরি হলো। এটাও সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য।

আদিম গোষ্ঠী সমাজে রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তিতে জোট বাঁধত মানুষ। অন্যদিকে সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো একে অন্যের সঙেগ সুযোগ-সুবিধার সম্পর্কে জোট বাঁধা। যেমন হরপ্পা সভ্যতার কথাই ধরা যাক। যে ব্যক্তি পুঁতি বানাত তার ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি দরকার হতো। ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি বানাত ব্রোঞ্জের কারিগর। আবার পাথর গরম করার জন্য দরকার হতো পাত্র। সেই পাত্র তৈরি করত কুমোর। এভাবেই পুঁতি বানানোর কারিগরকে ব্রোঞ্জের কারিগর এবং কুমোরের উপরে নির্ভর করতে হতো। এই পারস্পরিক নির্ভর করাটাই সভ্যতার বড়ো বৈশিষ্ট্য।

আবার গ্রাম ও নগরের পাশাপাশি টিকে থাকাও সভ্যতার জন্য জরুরি। নগরের বাসিন্দারা গ্রামের ফসলের উপরেই নির্ভর করে থাকত। এভাবেই নগর ও গ্রামকে ভিত্তি করে ভারতীয় উপমহাদেশে গড়ে উঠেছিল হরপ্পা সভ্যতা। তবে কোনো সভ্যতাই হঠাৎ গড়ে ওঠে না। তার পিছনেও থাকে ইতিহাস। এবারে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন সভ্যতার কথা জানব।

৩.২ মেহেরগড়

নতুন পাথরের যুগের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগে মানুষের জীবনযাপনে কতগুলি নতুন বিষয় যোগ হয়েছিল। একদিকে শুরু হয়েছিল কৃষিকাজ। অন্যদিকে পাথরের পাশাপাশি ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। অবশ্য ধাতু বলতে তখন শুধু তামা ও কাঁসার ব্যবহারই বোঝাত। লোহার ব্যবহার তখনও জানা ছিল না। তামা ও পাথর দুটোরই ব্যবহার হতো বলে এই সময়কে *তামা-পাথরের যুগ* বলা হয়।

এখনকার পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে মেহেরগড়ে তামা-পাথরের যুগের একটি প্রত্নকেন্দ্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। মেহেরগড় বোলান গিরিপথের থেকে

খানিক দূরে অবস্থিত। সেখানে মূলত একটি কৃষিনির্ভর সভ্যতার নজির পাওয়া যায়। সময়টা ছিল ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ। ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক জাঁ ফ্রাঁসোয়া জারিজ মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন রিচার্ড মেডো।

খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ পর্যন্ত মেহেরগড়ের সবথেকে পুরোনো পর্যায় ছিল বলে অনুমান করা যায়। ঐ পর্যায়ে সেখানকার মানুষ গম ও যব ফলাতে জানত। ছাগল, ভেড়া ও কুঁজওলা ষাঁড় ছিল তাদের গৃহপালিত পশু। পাথরের তৈরি জাঁতা ও শস্য পেষার যন্ত্র মেহেরগড়ে পাওয়া গেছে। পাথরের ছুরি ও পশুর হাড়ের যন্ত্রপাতিও এই পর্যায়ে মেহেরগড়ের মানুষ বানাতে পারত। তবে কোনো ধাতুর তৈরি জিনিস এই সময় পাওয়া যায়নি।

মেহেরগড়ের মাটির বাড়িগুলিতে রোদে পোড়ানো ইটের ব্যবহারও দেখা যায়। বাড়িগুলিতে একের বেশি ঘর থাকত। কয়েকটি ইমারত সাধারণ বাড়ির থেকে অনেক বড়ো। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন সেগুলিতে শস্য মজুত রাখা হতো। উপমহাদেশের সব থেকে পুরোনো শস্য মজুত রাখার বাড়ি মেহেরগড়েই পাওয়া গেছে।

মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব ধরা হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ পর্যন্ত। গম ও যবের পাশাপাশি এই পর্বে কার্পাস চাষেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও অবধি পৃথিবীতে সবথেকে পুরোনো কার্পাস চাষের নমুনা মেহেরগড়েই পাওয়া গেছে। মেহেরগড়ে পাওয়া পাথরের কাস্তে ভারতীয় উপমহাদেশে কাস্তে ব্যবহারের সব থেকে পুরোনো নজির। এই পর্যায়ে মেহেরগড়ে মাটির পাত্র তৈরি হতো। প্রথম দিকে পাত্রগুলি হাতে করে তৈরি করা হতো। তখনও কুমোরের চাকার ব্যবহার শুরু হয়নি। এই পর্বের একেবারে শেষের দিকে কুমোরের চাকায় তৈরি মাটির পাত্র দেখা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন রকম পাথর ও শাঁখ দিয়ে গয়না তৈরি হতো। শাঁখ ও পাথরগুলি মেহেরগড়ে বাইরে থেকে আসত।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০ অব্দ পর্যন্ত মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্ব ধরা হয়। এই সময় নানারকম গম এবং যব চাষ করা হতো। কুমোরের চাকায় মাটির পাত্র বানানোর কৌশল এই পর্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাত্রগুলি চুল্লিতে পুড়িয়ে সেগুলির গায়ে নানারকম নকশা ও ছবি আঁকা হতো। সেখানে একরঙা, দুইরঙা ও বহুরঙা মাটির পাত্র পাওয়া গেছে।

বসতি হিসেবেও মেহেরগড়ের আয়তন বেড়েছিল। এই পর্যায়ে নিয়মিত ভাবে তামার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তবে আকরিক থেকে ব্যবহারের জন্য তামা

বার করা সহজ ছিল না। ফলে পাথরের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহারও জারি ছিল। এই সময়ে মেহেরগড়ে সিলমোহরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সব মিলিয়ে গ্রামীণ কৃষিসমাজ আরও জটিল রূপ নিচ্ছিল। মেহেরগড়ে সেই বদলের চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়। সেই বদলের চিহ্নগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল হরপ্পা সভ্যতায়।

ছবি. ৩.১ : মেহেরগড়ে পাওয়া নারীমূর্তি

ছবি. ৩.২ : মেহেরগড়ের গ্রামের ধ্বংসাবশেষ

টুকরো কথা

মেহেরগড়ের সমাধি
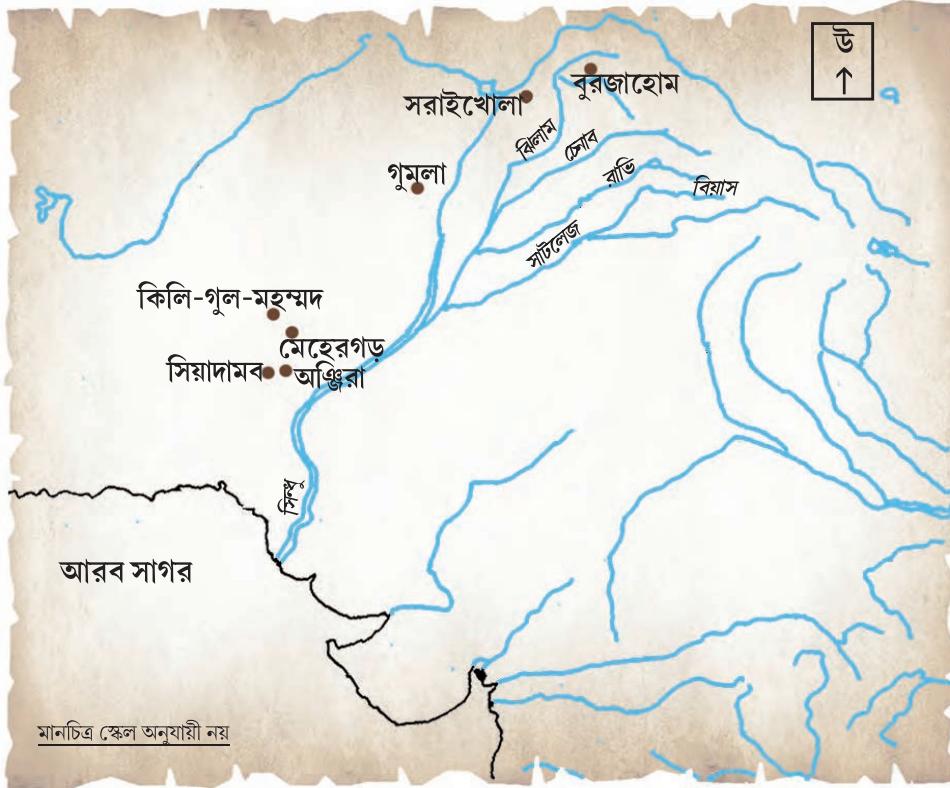
মেহেরগড় সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমাধিক্ষেত্র। সমাধিতে মৃতদেহ সোজাসুজি বা কাত করে শুইয়ে দেওয়া হতো। মৃতের সঙ্গে দেওয়া হতো নানা জিনিসপত্র। যেমন- শাঁখ বা পাথরের গয়না, কুড়ুল প্রভৃতি। এছাড়া সমাধিতে দেওয়া হতো নানা গৃহপালিত পশুও। সমাধিতে মূল্যবান পাথরও পাওয়া গেছে। মৃতদেহকে লাল কাপড় জড়িয়ে, লাল রং মাখিয়ে সমাধি দেওয়া হতো।

মানচিত্র ৩.১ : ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগের গ্রামীণ বসতির প্রথম ধাপ (উত্তর-পশ্চিম ভাগ)

৩.৩ হরপ্পা সভ্যতার কথা

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মহেনজোদাড়ো কেন্দ্র দুটি আবিষ্কার করা হয়। ঐ দুটি কেন্দ্রই সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত। তাই শুরুতে এই সভ্যতার নাম হয়েছিল *সিন্ধু সভ্যতা*। কিন্তু পরে সিন্ধু উপত্যকার বাইরেও এই সভ্যতার অনেক কেন্দ্রের খোঁজ মিলেছে। সেই সবকটা কেন্দ্রকেই সিন্ধু উপত্যকার কেন্দ্র বলার যুক্তি নেই। ফলে হরপ্পার নামেই ওই সভ্যতার নাম হয় *হরপ্পা সভ্যতা*। কারণ সেখানেই ঐ সভ্যতার প্রথম কেন্দ্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাছাড়া হরপ্পা ছিল ওই সভ্যতার সবথেকে বড়ো কেন্দ্র।

টুকরো কথা

হরপ্পা আবিষ্কারের কথা

সময়টা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। তখনকার পাঞ্জাব প্রদেশের সাহিওয়াল জেলায় গেছিলেন চার্লস ম্যাসন। ম্যাসনের ধারণা ছিল ওখানেই খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডারের সঙ্গে পুরুর যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তখনও ঐ অঞ্চলের আসল গুরুত্ব কেউ জানতেন না। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আলেকজান্ডার কানিংহাম ঐ অঞ্চলে যান। প্রত্নতত্ত্বে তাঁর উৎসাহ ছিল। তিনি ঐ অঞ্চলে খোঁড়াখুড়ি করে কিছু জিনিসপত্র পেয়েছিলেন। তবু তখনও হরপ্পা সভ্যতার বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে আবার কানিংহাম হরপ্পায় যান। গিয়ে দেখেন সেখানকার ইট রেললাইন বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখান থেকে কানিংহাম বেশ কিছু পাত্র পান। আর পান কয়েকটি সিলমোহর। তাতে খোদাই করা ছিল অজানা হরফের লেখা। কানিংহাম এবারেও হরপ্পার আসল গুরুত্ব বুঝতে পারেননি।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে হরপ্পার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। শেষপর্যন্ত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দয়ারাম সাহানি হরপ্পায় খোঁড়াখুড়ি শুরু করেন। তার পরের বছর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেনজোদাড়োতেও খননকাজ শুরু করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জন মার্শাল হরপ্পা ও মহেনজোদাড়ো বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। ম্যাসনের সময় থেকে ধরলে তখন প্রায় একশো বছর পেরিয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখা শুরু হয় তারপর থেকেই।

হরপ্পা সভ্যতা প্রায়-ইতিহাস যুগের সভ্যতা। কারণ হরপ্পার লোকেরা লিখতে জানত । কিন্তু, সেই লেখা আজও পড়া যায়নি। তাই প্রত্নবস্তুর উপর ভিত্তি করেই হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস জানতে হয়। এই সভ্যতার মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার জানত। সেজন্য **একে তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাও বলা হয়**। তামা-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাগুলির মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাই সবথেকে বড়ো। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার উন্নতির সময়। তবে মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতার সময়কাল ধরা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার

হরপ্পা সভ্যতা কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল? সাধারণ ভাবে বলা যায় জম্মুর মাণ্ডা ভারতীয় উপমহাদেশে এই সভ্যতার উত্তর সীমা। তবে তারও উত্তরে আফগানিস্তানের একটি প্রত্নক্ষেত্রেও হরপ্পা সভ্যতার অনেক লক্ষণ দেখা গেছে। দক্ষিণে গুজরাট ও কচ্ছ অঞ্চলে হরপ্পা সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে আরও দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের দৈমাবাদ অঞ্চলেও এই সভ্যতার ছাপ দেখা যায়। হরপ্পা সভ্যতার পশ্চিম সীমা বর্তমান পাকিস্তানের বালুচিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। পূর্ব দিকে হরপ্পা সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে আলমগিরপুর পর্যন্ত। এই অঞ্চলটা দিল্লির পূর্বদিকে। প্রায় সাত লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে ছিল হরপ্পা সভ্যতা।

মানচিত্র ৩.২ : হরপ্পা সভ্যতার কতগুলি কেন্দ্র

নগর পরিকল্পনা

ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম নগর গড়ে উঠেছিল। তাই একে *প্রথম নগরায়ণ* বলা হয়। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পা ছিল সবচেয়ে বড়ো দুটো নগর। সে তুলনায় লোথাল ও কালিবঙ্গান ছিল ছোটো। হয়তো হরপ্পা সভ্যতায় নগরগুলোর ক্ষেত্রে ছোটো-বড়ো তফাত ছিল। গুরুত্বের দিক থেকে সমস্ত নগর সমান ছিল না।

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র

হরপ্পা সভ্যতা অনেকগুলি কেন্দ্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া হলো

মহেনজোদাড়ো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান, চানহুদাড়ো, বানাওয়ালি, লোথাল, সুরকোটাডা, ধোলাবিরা, কুনতাসি

হরপ্পার নগরগুলিতে বসতি অঞ্চল দুটি স্পষ্ট ও আলাদা এলাকায় ভাগ করা ছিল। শহরে একটি উঁচু এলাকা থাকত। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাকে বলেন *সিটাডেল*। এই এলাকাটি একটা বানানো ঢিবির ওপর অবস্থিত ছিল। সাধারণত ঢিবিটি আয়তাকার হতো। উঁচু এলাকায় বানানো হতো জরুরি ইমারত। সেগুলি সচরাচর সাধারণ মানুষের থাকার বাড়ি হতো না। নগরের প্রধান বসতি এলাকাটা নীচু অঞ্চলে থাকত। ঐ অঞ্চলে ইমারতগুলির মধ্যে বেশিরভাগই বসত বাড়ি। উঁচু এলাকাটি প্রায়শই নগরের উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকত। নীচু বসতি এলাকাটা থাকত পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। একমাত্র চানহুদাড়োতে কোনো সিটাডেল ছিল না।

সিটাডেল এলাকাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। হরপ্পায় নগরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে দুটি ঢোকা ও বেরোনোর ফটক ছিল। মহেনজোদাড়োতে উঁচু এলাকায় একটি বড়ো জলাধার ছিল। সেটি পাকা পোড়ানো ইটের তৈরি। বোধহয় স্নান করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। আয়তাকার জলাধারটিতে ওঠানামার জন্য সিঁড়ির ধাপও ছিল। জলাধারটির কাছাকাছি কয়েকটি ছোটো ঘরও দেখা যায়। জলাধারটি সম্ভবত নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যবহার করতেন।

হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনে খাদ্যশস্য মজুত রাখার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পায় খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য দুটি বড়ো জায়গা ছিল। সেগুলি অনেকটা পাকা ইটের তৈরি বাড়ির মতো। হরপ্পায় শস্য রাখার বাড়িটির ভেতরে ছিল দুই সারিতে ভাগ করা মোট বারোটা বড়ো তাক। সেখানে হাওয়া চলাচলের জন্য ঘুলঘুলিও ছিল। ফলে খাদ্যশস্য শুকনো ও তাজা রাখা সম্ভব হতো। তাছাড়া শস্য ঝাড়াই-বাছাইয়ের ব্যবস্থাও ছিল। সেখানে দুই সারি ছোটো বাড়িও দেখা যায়। সম্ভবত ওখানে কাজ করত যারা তারা ওই বাড়িতে থাকত।

মহেনজোদাড়োর উঁচু এলাকায় আরেকটি বিশাল ইমারত পাওয়া গেছে। মনে করা হয় সেটি সাধারণ থাকার বাড়ি নয়। এই ইমারতটি সম্ভবত বড়ো

???

ভেবে দেখো

এর আগে তোমরা পাথরের যুগের মানুষের ইতিহাস পড়েছ। তেমনি জেনেছ মেহেরগড়ের ইতিহাস। আর এখন জানছ হরপ্পা সভ্যতা। ভাবোতো কীভাবে মানুষ ধাপে ধাপে পাথর থেকে নানা ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল?

কোনো উৎসবে জমায়েত হওয়ার জন্য ব্যবহার হতো। ঢোলাবিরা নগরের সিটাডেল এলাকায় একটি জলাধারও দেখা যায়।

নগরের নীচু এলাকায় থাকত মূল বসতি। বাড়িগুলির নানারকম আকার দেখা যায়। মহেনজোদাড়োতে প্রায় ৩০০ বর্গ মিটার আয়তনের একটি বাড়ি পাওয়া গেছে। তাতে সাতাশটা ঘর ও একটি আঙিনা ছিল। আরেকটা বড়ো বাড়িতে উপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঐ বাড়িটির হয়তো অনেকগুলি তলা ছিল। ঐ ধরনের বড়ো বাড়িতে ধনী মানুষেরাই থাকতেন বলে মনে করা হয়।

বসত বাড়িগুলিতে বেশ কিছু ঘর থাকলেও রান্নাঘর থাকত একটি। মনে করা হয় ঐ বাড়ির বাসিন্দাদের একটিই হেঁসেল ছিল। হয়তো হরপ্পা সভ্যতায় যৌথ পরিবার ছিল। ছোটো বাড়িগুলি দেখে মনে হয় সেগুলিতে গরিব মানুষেরা থাকতেন। এর থেকে হরপ্পার নগর জীবনে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শৌচাগার ও স্নানাগার। এর থেকে মনে হয় নগরগুলি সাধারণভাবে পরিষ্কার ছিল। মহেনজোদাড়োর নীচু এলাকায় প্রায় দু-হাজার বাড়ির জন্য অন্তত সাতাশটা কুয়ো ছিল। হরপ্পায় অত কুয়ো না থাকলেও, প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার ছিল। পাকা নর্দমা দিয়ে জল নিকাশি ব্যবস্থাও ছিল। বড়ো নর্দমাগুলি ঢাকা থাকত। প্রতিটি বাড়ি থেকে ছোটো নালা গিয়ে মিশত বড়ো নর্দমাগুলোয়। উন্নত নগর শাসনের নমুনা ছিল এই জল নিকাশি ব্যবস্থা।

???

ভেবে দেখো

হরপ্পা সভ্যতায় শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা কেন ছিল? আজও কি তোমরা শস্য /খাবার মজুত রাখার জায়গা দেখতে পাও?

টুকরো কথা

মহেনজোদাড়োর স্নানাগার

স্নানাগার হলো স্নান করার জায়গা। এমনই একটি স্নানাগারের খোঁজ পাওয়া গেছে মহেনজো-দাড়োতে। সেটি লম্বায় ১৮০ ফুট ও চওড়ায় ১০৮ ফুট। তার চারি-দিকে ৮ ফুট উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এর মাঝামাঝি অংশে একটি বড়ো জলাশয় ছিল। জলাশয়টিতে বাইরের জল ঢোকা বন্ধ করা হয়েছিল। আবার অতিরিক্ত জল বার করে দেওয়াও যেত। জল পরিষ্কার করার ব্যবস্থাও ছিল।

ছবি.৩.৩: মহেনজোদাড়োর স্নানাগার

শহরের নীচু এলাকায় যাতায়াতের উপযোগী সড়ক ছিল। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পায় বেশ কয়েকটি চওড়া, পাকা রাস্তা দেখা গেছে। ওই রাস্তাগুলি সাধারণত উত্তর-দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। তুলনায় কম চওড়া রাস্তা ও সরু গলিগুলো ছিল পূর্ব-পশ্চিমে। পথঘাটের এরকম পরিকল্পনার জন্য নগরের নকশাগুলো হতো চৌকো আকারের। মনে হয় হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনের মান ছিল খুব উঁচু। সেই মান ধরে রাখার জন্য নিশ্চয়ই দক্ষ ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার দরকার হতো। নগরের উঁচু অংশে সম্ভবত প্রশাসকরা থাকতেন ।

ছবি. ৩.৪: হরপ্পা সভ্যতার একটি কূপ

বাণিজ্যের উন্নতির কারণে হরপ্পার নগরগুলিতে হয়তো বণিকদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তারপরে ছিল বিভিন্ন কারিগর ও পেশার মানুষ। মনে হয় এই সমাজে মজুর ও শ্রমিকদের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। তবে এরা সবাই নগরেই বাস করত। নগরের বাইরে গ্রামীণ এলাকায় থাকত কৃষিজীবী মানুষ। নগরে সরাসরি খাদ্য উৎপাদন হতো না। খাদ্যশস্যের জন্য নগরবাসীদের গ্রামের ওপরেই নির্ভর করতে হতো। গ্রামে নানারকম ফসলের চাষ হতো। যেমন, গম, যব, জোয়ার, বাজরা, নানারকম ডাল, সরষে এবং ধান। তবে ধানের ফলন সব জায়গায় হতো না। শুধু গুজরাটের রংপুর ও লোথালেই ধানের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাছাড়া তুলো, তিল প্রভৃতি ফসলেরও চাষ হতো। রাজস্থানের কালিবঙ্গানে একটি ক্ষেতে কাঠের লাঙলের ফলার দাগও পাওয়া গেছে।

কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল পশুপালন। হরপ্পার মানুষ গৃহপালিত পশুর ব্যবহার জানত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গবাদি পশু। ষাঁড়, ভেড়া ও ছাগলের ব্যবহার হতো। উটের ব্যবহারও হরপ্পার লোকেরা জানত। তবে ঘোড়ার ব্যবহার

টুকরো কথা

হরপ্পা সভ্যতার শাসক

মহেনজোদাড়োয় একটা পুরুষের মূর্তি পাওয়া গেছে। তার চুল আঁচড়ানো, গালে চাপদাড়ি। চোখ আধবোজা। কপালে ও ডান বাহুতে একটা করে পাথর বসানো পটি বাঁধা। মূর্তিটার বাঁ-কাঁধ থেকে একটা চাদর ঝুলছে। এই মূর্তিটা কার তা নিয়ে ধাঁধা আছে। রাজার না পুরোহিতের? নাকি একজন পুরোহিত-রাজার মূর্তি? হরপ্পায় বড়ো বাড়ি ছিল। তবে সেগুলো কি রাজপ্রাসাদ ছিল? তাহলে হরপ্পার শাসন কারা চালাতেন? রাজা, পুরোহিত-রাজা নাকি বণিকরা? এসব প্রশ্নের নিশ্চিত সমাধান এখনও হয়নি।

হরপ্পার মানুষ জানত না। এছাড়াও ছিল ঘুরে বেড়ানো পশুপালক গোষ্ঠী। এইসব মিলিয়ে হরপ্পা সভ্যতার সমাজ গড়ে উঠেছিল।

মূর্তিগুলি দেখে হরপ্পার মানুষদের পোশাক, গয়না ও সাজগোজ সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। তারা সুতি ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। হরপ্পা সভ্যতার নানা জায়গায় অনেক সোনা, রুপো, তামা ও হাতির দাঁতের গয়না পাওয়া গেছে।

কারিগরি শিল্প

হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতির অন্যতম জরুরি দিক ছিল কারিগরি শিল্প। পাথর ও ধাতু — দুটোরই ব্যবহার হতো কারিগরি শিল্পে। ধাতুর মধ্যে তামা, কাঁসা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হতো। লোহার ব্যবহার হরপ্পার মানুষ জানত না। এই সভ্যতায় তামা ও কাঁসার তৈরি ছুরি, কুঠার, বাটালি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া মাটি ও ধাতুর বাসনপত্রও বানানো হতো। পাথরের ছুরি তৈরির কারখানাও হরপ্পা সভ্যতায় ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার নানারকম মাটির পাত্র ছিল কারিগরির উন্নতির নজির। বেশিরভাগ পাত্র সাদামাটা, রোজকার ব্যবহারের জন্য। পোড়ানোর ফলে সেগুলি লালচে রঙের হয়ে উঠেছিল। কিছু পাত্রের গায়ে চকচকে লাল পালিশ লাগানো হতো। সেগুলির গায়ে উজ্জ্বল কালো রঙের নকশাও আঁকা হতো। ঐ পাত্রগুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা *লাল-কালো মাটির পাত্র* বলেন। তুলনায় হালকা ও পাতলা ঐ মাটির পাত্রগুলি রোজগার কাজে ব্যবহার হতো না। মাটি দিয়ে থালা, বাটি, রান্নার বাসন, জালা জাতীয় পাত্র হরপ্পা সভ্যতায় তৈরি হতো।

হরপ্পা সভ্যতায় কাপড় বোনার কারিগরিও ছিল। মহেনজোদাড়োতে পুরোনো কাপড় বানানোর নজির পাওয়া গেছে। কাপড়ে সুতোর কাজ করার শিল্পও হরপ্পা সভ্যতায় দেখা যায়। মহেনজোদাড়ো থেকে পাওয়া পুরুষ মূর্তিটির গায়ের পোশাকে তারই নমুনা রয়েছে।

ইট বানানোর শিল্প এই সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি দিক। কাদামাটির ইট ও চুল্লিতে পোড়ানো পাকা ইট — দুয়েরই ব্যবহার দেখা যায়। তবে চুল্লিতে পোড়ানো পাকা ইট সম্ভবত জরুরি ইমারত বানানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো।

হরপ্পা সভ্যতার কারিগরি শিল্পের অন্যতম নমুনা অনেকরকম মালার দানা। সেকাজে সোনা, তামা, শাঁখ, দামি-কমদামি পাথর, হাতির দাঁত প্রভৃতির ব্যবহার হতো। নীলচে লাপিস লাজুলি পাথরও গয়না বানাতে লাগত। মালার দানা বানানোর কারখানাও হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গেছে। সূক্ষ্ম ওজন মাপার বাটখারারও খোঁজ মিলেছে।

ছবি. ৩.৫: হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গয়না, মাটির পাত্র ও বাটখারা

ছবি. ৩.৬:
হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া ব্রোঞ্জের নারী মূর্তি

হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম পাথর ও ধাতুর ভাস্কর্যের নমুনা দেখা যায়। পাশাপাশি পোড়ামাটির ভাস্কর্যেরও নজির রয়েছে। একটি ব্রোঞ্জের তৈরি নারী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে মহেনজোদাড়ো থেকে। শিল্পের দিক থেকে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রোঞ্জের তৈরি কয়েকটি পশু-মূর্তিও হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গিয়েছে। তবে পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি সংখ্যায় অনেক বেশি। নারী মূর্তি, পশু ও পাখির মূর্তি তৈরিতে পোড়ামাটির ব্যবহার হতো। পোড়ামাটির তৈরি বানরের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি সম্ভবত খেলনা ছিল।

কিন্তু এতরকম কারিগরি শিল্পের জন্য দরকারি কাঁচামাল কোথা থেকে পাওয়া যেত? সমস্ত কাঁচামাল অবশ্যই হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া যেত না। বিভিন্ন এলাকা থেকে নানারকম কাঁচামাল নিয়ে আসা হতো। কাঁচামাল আনানোই ছিল হরপ্পা সভ্যতার ব্যবসাবাণিজ্যের অন্যতম প্রধান দিক। সেই কাজে হরপ্পা সভ্যতার সিলমোহরগুলিও অবশ্যই ব্যবহার হতো। এই সভ্যতার ইতিহাস জানার জন্য এই সিলমোহরগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টুকরো কথা
হরপ্পা সভ্যতার সিলমোহর

ছবি. ৩.৭: হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া একটি সিলমোহর

হরপ্পা সভ্যতায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনেক সিলমোহর পেয়েছেন। সিলমোহরগুলিতে নানা লিপি ও প্রতীকচিহ্ন খোদাই করা হতো। বেশিরভাগ হরপ্পীয় সিলমোহর একধরনের নরম পাথর কেটে তৈরি। বেশিরভাগ সিলমোহরে একটা উলটো নকশা খোদাই করা হতো। নকশাটি সাধারণত কোনো না কোনো জীবজন্তুর। তার সঙেগ একসারি লিপি খোদাই করা থাকত। ভিজে কাদামাটিতে ঐ সিলমোহরটার ছাপ দিলে তা সোজা হয়ে পড়ত। সিলগুলো বানাবার পরে সেগুলোতে একরকমের সাদা জিনিস মাখানো হতো। তারপরে সেগুলো পোড়ানো হতো। ফলে খুবই শক্ত হয়ে যেত সিলগুলি। বেশিরভাগ সিলমোহরে একশিংওলা একটি কল্পিত প্রাণীর ছাপ দেখা যায়। তাছাড়া অন্যান্য ছাপও সিলমোহরে আছে। শিংওলা মানুষ,ষাঁড়, গাছ ও জ্যামিতিক নকশা খোদাই করা সিলমোহর পাওয়া গেছে। সিলমোহরগুলি থেকে হরপ্পার অর্থনীতি ও ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়।

হরপ্পার বাণিজ্য

হরপ্পা সভ্যতার তেইশটা সিলমোহর পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়ায়। এর থেকে বোঝা যায় এই দুই সভ্যতার মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। মেসোপটেমিয়াতে সম্ভবত হরপ্পার বণিকরা পাকাপাকি বসতিও গড়ে তুলেছিল। মেসোপটেমিয়াতে একটি সিলমোহরে খোদাই করা লিপি পাওয়া গেছে। সেটা পড়ে

জানা যায় হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে জলপথে মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। হরপ্পা সভ্যতার আমলে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার সমুদ্রবাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা জানা দোভাষীদেরও গুরুত্ব বেড়েছিল। সম্ভবত বিদেশ থেকে হরপ্পা সভ্যতায় আমদানি করা হতো সোনা, রুপো, তামা, দামি পাথর, হাতির দাঁতের তৈরি চিরুনি, পাখির মূর্তি প্রভৃতি। আর রফতানি করা হতো বার্লি, ময়দা, তেল ও পশমজাত দ্রব্য।

ছবি. ৩.৮: লোথাল বন্দরের ধ্বংসাবশেষ

তবে শুধু জলপথেই নয়, স্থলপথেও হরপ্পার বাণিজ্য চলত। ইরানে হরপ্পা সভ্যতার সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। আবার এখনকার তুর্কমেনিস্তানে হরপ্পায় তৈরি শিল্পদ্রব্যের খোঁজ মিলেছে। এইসব আমদানি-রফতানি স্থলপথের মাধ্যমেই হতো।

হরপ্পা সভ্যতায় যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপায় ছিল। ভারবাহী পশু, গাড়ি, নৌকা ও জাহাজের ব্যবহার হতো। স্থলপথ ও জলপথে রোজকার যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বলদ, গাধা ও উটের ব্যবহার হতো হরপ্পা সভ্যতায়। তবে গাধা ও উট সম্ভবত ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। গাড়ি টানার কাজে বলদের ব্যবহার হতো বেশি। হরপ্পায় অনেক গাড়ির আদলে বানানো কাদামাটির খেলনা গাড়ি পাওয়া গেছে। সেগুলিতে চাকার ব্যবহারও আছে। বেশিরভাগ গাড়ি ছিল দু-চাকার। চাকাগুলি বেশ শক্ত। গোল করে কাটা তিনটি সমান মাপের তক্তা দিয়ে সেগুলি তৈরি। আবার কয়েকটি ছোটো গাড়িও পাওয়া গেছে। সেগুলিতে অনেক চাকা লাগানো।

হরপ্পার রাস্তায় গাড়ির চাকার গভীর ছাপ পাওয়া গেছে। তার থেকে বোঝা যায় গাড়ির কাঠামোগুলো নেহাত ছোটো ছিল না। হরপ্পার অনেক রাস্তাই এবড়ো-খেবড়ো ছিল। বলদে টানা গাড়িগুলি উঁচু-নীচু রাস্তায় সহজেই চলতে পারত।

তবে গাড়ির থেকে নৌকায় যাতায়াতে সময় কম লাগত। পশুতে টানা গাড়ি চলত খুব আস্তে। তার উপর পশুদের খাওয়াতে খরচ হতো। বরং নদীর

টুকরো কথা

বন্দর নগর : লোথাল

গুজরাটি ভাষায় *লোথ* ও *থল* থেকে **লোথাল**। **এর মানে মৃতের স্থান**। গুজরাটের ভোগাবোর নদীর তীরে ছিল হরপ্পা সভ্যতার বন্দর-নগর লোথাল। এখানে পাওয়া যায় জাহাজঘাটা ও সমাধিক্ষেত্রের নমুনা। সম্ভবত সেখানে জাহাজ রাখার, বানাবার ও মেরামতির বন্দোবস্ত ছিল। লোথালে বোতাম আকারের সিলমোহর পাওয়া গেছে। সম্ভবত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এখানে নারীমূর্তি, দাবার ঘুঁটির মতো ঘুঁটি, খেলনা গাড়ি পাওয়া গেছে। তাছাড়া পাওয়া গেছে নানা গয়নাও। গুজরাটের উপকূল অঞ্চলে হওয়ার জন্য লোথাল সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিত বলে মনে হয়।

স্রোত ও হাওয়ার সাহায্যে সহজেই নৌকা চলতে পারত। কাজেই জলপথে যাতায়াত অনেক সস্তা ছিল। মহেনজোদাড়োর সিলমোহরে নৌকার ছবি খোদাই করা আছে। পালতোলা নৌকার ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতায় ছিল। হরপ্পার অর্থনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটাই নদীর উপর নির্ভর করত।

হরপ্পার ধর্ম

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হরপ্পার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক পোড়ামাটির নারীমূর্তি পেয়েছেন। তার থেকে মনে করা হয় ঐ মূর্তিগুলির পুজো হতো। অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতায় মাতৃপুজোর চল ছিল বলে মনে হয়। মহেনজোদাড়োতে একটি সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। সেটিতে এক যোগীর মূর্তি খোদাই করা আছে। ঐ যোগী জোড়াসনে বসে আছে। তার চারপাশে রয়েছে গন্ডার, বাঘ, হাতি ইত্যাদি বেশ কিছু বন্যপ্রাণী। একসময় ওই মূর্তিটিকে পশুপতি শিবের আদি রূপ বলে মনে করা হতো। কিন্তু *পশু* শব্দে গৃহপালিত প্রাণী বোঝায়। অথচ ওই মূর্তির চারপাশে সবই বন্যপ্রাণী দেখা যায়। সেকারণে ওই মূর্তিটাকে পশুপতি শিবের আদিরূপ মনে করার যুক্তি নেই ।

ছবি. ৩.৯:
হরপ্পার দুটি সিলমোহর

???
ভেবে দেখো

হরপ্পার সিলমোহর দুটিতে কোন কোন পশুর ছাপ দেখতে পাচ্ছো?

হরপ্পার মানুষ নানারকম জীবজন্তু ও গাছপালার পুজো করত। একশিংওলা কাল্পনিক পশুর মূর্তির পুজো খুব বেশি হতো। হরপ্পার সিলমোহরে ষাঁড়ের ছাপ থেকে মনে হয় ষাঁড়ের পুজোও হতো। কিন্তু সিলমোহরে কখনোই গোরুর মূর্তি দেখা যায় না। অশ্বত্থ গাছ ও পাতার ছবি সিলমোহর ও মাটির পাত্রে দেখা যায়। অশ্বত্থ গাছকে দেবতা হিসেবে পুজো করা হতো বলে মনে হয়। ধর্মীয় কাজে জলের ব্যবহার হতো। হয়তো মহেনজোদাড়োর জলাশয়টি ধর্মীয় কাজে ব্যবহার হতো।

হরপ্পা সভ্যতায় মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হতো। মৃতদেহর মাথা উত্তর দিকে করে শুইয়ে রাখা হতো। সমাধির ভিতরে গয়না ও মাটির পাত্র রাখা হতো। কালিবঙ্গানে ইটের তৈরি সমাধিও দেখা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়

বিশাল ও বৈচিত্র্যময় হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের পরে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। অথচ হঠাৎ করে একটি সভ্যতা শেষও হয়ে যায় না। বেশ কিছু ঘটনার যোগফলে হরপ্পা সভ্যতার অবনতি হয়েছিল। মহেনজোদাড়ো নগরের বিরাট পাঁচিলটি বেশ কয়েকবার নষ্ট হয়েছিল। পাঁচিলটিতে একই

জায়গায় অনেকবার মেরামতির ছাপ দেখা যায়। তাছাড়া পাঁচিলের গায়ে কাদার চিহ্নও পাওয়া গেছে। ওই জমে থাকা কাদা সম্ভবত বন্যার ফলে এসেছিল। সিন্ধুনদের বন্যায় মহেনজোদাড়োর ক্ষতি হয়েছিল বলে মনে হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ অব্দ নাগাদ থেকে এশিয়া মহাদেশের অনেক জায়গাতেই বৃষ্টিপাত কমতে থাকে। ফলে শুষ্ক জলবায়ু দেখা দেয়। তার জন্য কৃষিকাজ সমস্যার মুখে পড়েছিল। হরপ্পা সভ্যতার কৃষিব্যবস্থাও এই সমস্যার আওতায় পড়েছিল বলেই মনে হয়। তাছাড়া ইট পোড়ানোর জন্য চুল্লির জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার হতো। গাছ কেটেই ঐ কাঠ পাওয়া যেত বলে মনে হয়। ব্যাপকভাবে গাছ কাটার ফলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গিয়েছিল।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ অব্দের পরের দিকে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। এর ফলে হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতি সমস্যায় পড়েছিল বলে মনে হয়। পাশাপাশি, নগর-শাসন ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এইসব সমস্যাগুলি থেকে বেরোবার পথ হরপ্পা সভ্যতার মানুষরা বের করতে পারেনি।

হরপ্পা সভ্যতার লিপি

হরপ্পার বাসিন্দারা লিখতে পারতেন। তাঁদের লিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু মুশকিল হলো, সেই লিপি আজ অবধি পড়া যায়নি। শুধু লিপির খানিকটা অনুমান করা যায়। হরপ্পার লিপি সাংকেতিক। তাতে ৩৭৫ থেকে ৪০০টার মতো চিহ্ন রয়েছে। তবে হরপ্পার লিপিতে বর্ণমালা সম্ভবত ছিল না। এই লিপি লেখা হতো ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে। লিপিতে ছোটো চিহ্নগুলি হয়তো সংখ্যা বোঝায়। অনুমান করা হয় দ্রাবিড় ভাষাগুলির সঙ্গে হরপ্পার ভাষার মিল ছিল। ঋকবেদের ভাষাতেও দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পাত্র, সিলমোহর, তামার ফলক নানা কিছুর উপরেই হরপ্পার লিপি পাওয়া গেছে। লিপি সাজিয়ে সাইনবোর্ডের মতো জিনিস ঢোলাবিরা কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতার উন্নতির নমুনা এই লিপি। সেগুলি ঠিকমতো পড়া গেলে ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক অজানা ইতিহাস জানা যাবে।

ছবি. ৩.১০: হরপ্পার মাটির পাত্রের টুকরো

ছবি. ৩.১১: হরপ্পার পোড়ামাটির হাতি

ছবি. ৩.১২: হরপ্পার সিলমোহরে যোগীমূর্তি

ছবি. ৩.১৩: হরপ্পার সিলমোহরে কাল্পনিক পশু

ছবি. ৩.১৪: হরপ্পার পোড়ামাটির গাড়ি

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। **বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :**

১.১) তামা, কাঁসা, পাথর, লোহা

১.২) ঘোড়া, হাতি, গন্ডার, ষাঁড়

১.৩) কালিবঙ্গান, মেহেরগড়, বানাওয়ালি, ঢোলাবিরা

২। **নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :**

২.১) লিপির ব্যবহার সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য।

২.২) মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানি।

২.৩) হরপ্পা সভ্যতা প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা।

২.৪) হরপ্পার মানুষ লিখতে জানতেন।

৩। **সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১) হরপ্পা সভ্যতার বাড়িঘরগুলি তৈরি হতো — (পাথর দিয়ে/পোড়া ইট দিয়ে/কাঠ দিয়ে)।

৩.২) হরপ্পা সভ্যতা ছিল — (পাথরের যুগের/ লোহার যুগের/ তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের) সভ্যতা।

৩.৩) ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পাতেই — (প্রথম নগর / প্রথম গ্রাম/ দ্বিতীয় নগর) দেখা গিয়েছিল।

৪। **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন / চার লাইন) :**

৪.১) তোমার জানা কোনো একটি শহরের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার শহরের মিল-অমিলগুলি খুঁজে বার করো।

৪.২) সিন্ধুনদীর তীরে হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি কেন গড়ে উঠেছিল বলে তোমার মনে হয়?

৪.৩) হরপ্পা সভ্যতায় কী ধরনের বাড়িঘর পাওয়া গেছে? সেগুলিতে কারা থাকতেন বলে মনে হয়?

৪.৪) তোমার কি মনে হয়, হরপ্পা সভ্যতার মানুষ স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন? তোমার স্থানীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হরপ্পার মানুষের থেকে কোন কোন বিষয় তুমি শিখবে?

৫। **হাতেকলমে করো :**

৫.১) হরপ্পা সভ্যতায় শহর ও মানুষের জীবন কেমন ছিল? তার ছবি দিয়ে চার্ট তৈরি করো।

৫.২) হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শনগুলি মাটি, পিচবোর্ড বা থার্মোকল দিয়ে বানাও। ঐ প্রত্ন-নিদর্শনগুলি হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস জানতে কীভাবে সাহায্য করে?

৪

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা

দ্বিতীয় পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ

ঠা*কুমার ঝুলি* পড়ে তানিয়ার মনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হলো। রুবির দাদুর কাছে একদিন ও জানতে চাইল সেগুলোর উত্তর। আচ্ছা দাদু, রাক্ষস-রাক্ষসীরা কি সত্যিই ভয়ানক দেখতে হয়?

অরুণ বলল, মেলার মাঠে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখেছি। রাবণ তো রাক্ষস রাজা। তাই হারুকাকা রাবণ সাজার জন্য মুখে কালি মেখেছিলেন।

তিতির বলল, দাদু, রামায়ণের রাবণের সত্যিই দশটা মাথা ছিল?

দাদু সবসময় ওদের প্রশ্ন শুনে খুশিই হন। বললেন, মানুষের কল্পনায় আর কথায় এভাবেই গল্পগাথা তৈরি হয়। রাক্ষসের যে বর্ণনা তোমরা জানো, সে সবই মানুষের কল্পনা। রামায়ণের গল্পকথায় কিন্তু রাবণ খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। আর দশটা মাথা মানে দশ দিকে যার মাথা খাটে।

পলাশ বলল, তাহলে রাবণকে কবে থেকে আর কেন ভয়ানক ভাবা শুরু হলো?

দাদু বললেন, এই তো ইতিহাসের *কেন* ও *কবে* তোমাদের ভাবাতে শুরু করেছে। *রামায়ণ* কী তা তোমরা সবাই জানো?

সুরাইয়া বলল, *রামায়ণ* তো রাম-রাবণের যুদ্ধের গল্প। আচ্ছা দাদু, *রামায়ণ* কি ইতিহাস?

দাদু বললেন, ইতিহাস সবেতেই আছে। কোথায়, কতটা, কীভাবে ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেটা খোঁজাই ইতিহাসের গোয়েন্দার কাজ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মোবাইল ফোনে কথা বলেছ বা দেখেছ। মোবাইল নিয়ে নিজের রাজ্য বা দেশের বাইরে গেলে বেশি টাকা কাটে কেন জানো?

অরুণ বলল, বাইরে ঘোরা বা *রোমিং* (**Roaming**)-এর জন্য।

দাদু বললেন, ইংরেজিতে **Roaming** শব্দটার একটা মানে হলো *ঘোরা*। আবার সংস্কৃতে *রাম* শব্দের একটা অর্থ *যিনি ঘুরে বেড়ান*। খেয়াল করো ইংরেজি আর সংস্কৃত শব্দ দুটির অর্থের মধ্যের মিলটা। কোনো এক সময়ে একদল যাযাবর ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। সেখানকার পুরোনো বাসিন্দাদের সঙ্গে শুরু হলো তাদের মেলামেশা। তার সঙ্গে চলল যুদ্ধ-লড়াই। সেই যুদ্ধে বেশিরভাগ সময় বাইরে থেকে আসা মানুষগুলি জিতে গেল। তারপর আস্তে আস্তে উপমহাদেশের উত্তর অংশে তারা বসতি তৈরি করল। ধীরে ধীরে দক্ষিণ অংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল তারা। মনে করা হয়, দক্ষিণ অংশে ছড়িয়ে পড়ার সেই কাহিনিই রামায়ণে পাওয়া যায়।

যুদ্ধে জয় আর বসতি গড়ে তোলার কথা ঘিরে তৈরি হলো অনেক গল্প। সেগুলি ফিরতে লাগল মুখে মুখে। সেই গল্পগুলোতে যুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষদের অন্যরকমভাবে দেখানো হলো। তারা কখনও *রাক্ষস* বা *অসুর*, কখনও বা *দৈত্য*। তাছাড়া তারা কখনও *অসভ্য* বা *দস্যু*। *রামায়ণ* সেই যুদ্ধে জেতা মানুষদের গল্প। তাই হেরে যাওয়া রাবণ সেখানে খারাপ ও ভয়ানক।

পরের দিন ইতিহাসের ক্লাসে দাদুর বলা কথাগুলো বলল তানিয়া। দিদিমণি বললেন, রামায়ণের ও মহাভারতের গল্পের আগের অনেক গল্পকথাও জানা যায়। সেইসব কথা আছে *বেদ*-এ। আজ আমরা সেই সময়ের কথাই জানব।

৪.১ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পরিবার

তোমরা *রাম* ও Roaming শব্দের মিল পেয়েছ অর্থে ও উচ্চারণে। এমনই আরও অনেক শব্দ আছে। যেমন ধরো, বাংলায় *মা*, সংস্কৃতে *মাতঃ* বা *মাতৃ*, ইংরাজিতে Mother, লাতিন-এ *মাতের*। *পিতৃ* বা *ভ্রাতৃ* শব্দগুলোরও এমনই মিল রয়েছে বেশ কিছু ভাষার শব্দের সঙ্গে। উচ্চারণ ও অর্থের মিল কিন্তু এমনি এমনি হয় না। মানুষের পরিবারের মতো ভাষারও পরিবার আছে। সেই একই পরিবারের ভাষাগুলির মধ্যে বেশ কিছু মিল থাকে। তেমনই একটা ভাষা পরিবার হলো *ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার*। ভারতীয় উপমহাদেশ ও ইউরোপের অনেক ভাষাই এই ভাষা পরিবারের সদস্য। এদেরকে তাই একসঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার বলা হয়। এই ভাষা ব্যবহারকারীরা কোথায় থাকতো?

শব্দের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, তারা তৃণভূমি অঞ্চলের মানুষ ছিল। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত শব্দ বিশেষ ব্যবহার হয়নি। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে তারা মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলের যাযাবর ছিল। তাদের নিজেদের ও তাদের পালিত পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিলে তারা ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ইরানে ও ভারতে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের এক সদস্য *ইন্দো-ইরানীয় ভাষা*। ঐ ভাষা মানুষের মুখে ধীরে ধীরে বদলে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে মিশেছে নানান আঞ্চলিক শব্দ। সংস্কৃত ভাষা সেই ভাষাগুলির মধ্যে একটি।

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বর্তমানে আর নেই। *ঋকবেদ* ও *জেন্দ-অবেস্তায়* ইন্দো-ইরানীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই দুটি সাহিত্যের ভাষায় ও বর্ণনায় বেশ কিছু মিল দেখা যায়। এর থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার অস্তিত্ব জানা যায়। তবে মিলের পাশাপাশি ঐ দুই রচনায় বেশ কিছু অমিলও দেখা যায়। যেমন, ঋকবেদে যারা *দেব*, তারা সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু অবেস্তায় যারা *দয়েব* (দেব), তাদের ঘৃণা করা হতো। আবার অবেস্তার শ্রেষ্ঠ দেবতা *অহুর*। অথচ বৈদিক সাহিত্যে *অসুর* (অহুর) খারাপ বলে পরিচিত। হয়তো কোনো কারণে ইন্দো-ইরানীয় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়েছিল। তার ফলে ঐ গোষ্ঠীর একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছেছিল। এদেরই *ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী* বলা হয়। এক্ষেত্রে মনে রেখো **আর্য কোনো জাতিবাচক শব্দ নয়**। ইন্দো-আর্য ভাষারই সবথেকে পুরোনো সাহিত্য *ঋকবেদ*।

অনেকে অনুমান করেন উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ইন্দো-আর্যরা ভারতে ঢুকেছিল। বৈদিক সাহিত্য থেকেই এই ইন্দো-আর্যদের বসতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়। তাই এই সভ্যতার নাম *বৈদিক সভ্যতা*।

৪.২ বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? *বেদ* এসেছে *বিদ* শব্দ থেকে। *বিদ* মানে *জ্ঞান*। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য চার ভাগে ভাগ করা যায়। *সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক* ও *উপনিষদ*। *ঋক, সাম, যজুঃ* ও *অথর্ব* — এই চারটি হলো সংহিতা। সংহিতাগুলি ছন্দে বাঁধা কবিতা। *ঋকবেদ* সবথেকে পুরোনো বৈদিক সংহিতা। ঋকবেদ রচনার ভাষা আর ভৌগোলিক পরিবেশের উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। বাকি তিনটি সংহিতা ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য ঋকবেদের পরের রচনা। তাই সেগুলিকে *পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য* বলা হয়। অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের দুটি ভাগ। আদি বৈদিক সাহিত্য ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্য থেকেই বৈদিক সভ্যতার ইতিহাস জানা যায়। তাই বৈদিক যুগেরও ভাগ দুটি। *আদি বৈদিক যুগ* ও *পরবর্তী বৈদিক যুগ*। আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার একমাত্র উপাদান *ঋকবেদ*। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগের ইতিহাস জানা যায়।

ভেবে দেখো

১. তুমি কোন ভাষায় কথা বলো? সেই ভাষাটি কোন ভাষা পরিবার থেকে এসেছে বলে মনে হয়?

২. বলতে পারো ইন্দো- ইউরোপীয়রা তৃণভূমি অঞ্চলে কেন বাস করত?

মনে রেখো

- ঋকবেদের সূক্তগুলি ছন্দে বাঁধা ঋক-এর সমষ্টি। তাই ঐ সংহিতার নাম ঋক সংহিতা। সংহিতা কথার অর্থ সংকলন করা।
- সামবেদ সংহিতার বেশিরভাগটাই ঋকবেদের থেকেই নেওয়া। কেবল সামবেদ সুর করে গানের মতো গাওয়া হতো।
- যজুর্বেদ মূলত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে দরকারি মন্ত্রের সংকলন। মন্ত্রগুলি কিছুটা পদ্যে ও কিছুটা গদ্যে লেখা।
- অথর্ববেদ জাদুমন্ত্রের সংকলন। বৈদিক যুগে ও তার পরেও দীর্ঘদিন অথর্ববেদকে সংহিতা বলে ধরা হতো না।
- সংহিতাগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য তৈরি হয়েছিল গদ্যে লেখা ব্রাহ্মণ।
- আরণ্যকগুলি যারা লিখতেন তারা অরণ্যে (বনে) থাকতেন। যাগযজ্ঞের ব্যাখ্যা ও নানা চিন্তাভাবনা আরণ্যক সাহিত্যে দেখা যায়।
- বেদ-এর নানা তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও চিন্তাভাবনা উপনিষদে আছে।
- বৈদিক সাহিত্যগুলিকে ঠিক মতো উচ্চারণ করা, ছন্দ, আসল অর্থ বোঝার জন্য রচনা হয়েছিল বেদাঙ্গ। সংখ্যায় বেদাঙ্গ ছ-টি। এছাড়াও নক্ষত্রের অবস্থান, বিভিন্ন নিয়ম, জ্যামিতির ধারণা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য ঠিক কোন সময়ের রচনা তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। মোটামুটিভাবে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দকে আদি বৈদিক যুগ বলে ধরা যায়। তারপর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত পরবর্তী বৈদিক যুগ। তবে মনে রাখা দরকার, তারপরেও বৈদিক সাহিত্য লেখার কাজ চলেছিল। এখন যে চেহারায় বৈদিক সাহিত্য পাওয়া যায় তা অনেক পরের রচনা।

বেদের ভূগোল

বৈদিক সাহিত্যে পর্বত ও নদীর নাম থেকে উপমহাদেশে আর্যদের বসতির কথা বোঝা যায়। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে ঋকবেদে ভূগোল বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। ঋকবেদে হিমালয় (হিমবৎ) ও কাশ্মীরের মূজবন্ত শৃঙ্গের উল্লেখ আছে। বিন্ধ্যপর্বতের উল্লেখ নেই। ঋকবেদে অনেক নদীর কথা বলা হয়েছে। তার থেকে মনে হয় ঐ নদীর কাছাকাছি এলাকাগুলিতেই ছিল আদি

বৈদিক যুগের বসতি। ঋকবেদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল সিন্ধু। সরস্বতী নামে যে নদীর কথা ঋকবেদে রয়েছে, তা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঋকবেদের মানুষ গঙ্গা ও যমুনা নদীর এলাকার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। ঋকবেদের একেবারে শেষের দিকে মাত্র একবার গঙ্গা ও যমুনা নদীর কথা পাওয়া যায়।

ঋকবেদের ভূগোল থেকে আদি বৈদিক সভ্যতা কতটা ছড়িয়েছিল তা বোঝা যায়। আজকের আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সঙ্গে আদি বৈদিক যুগের মানুষের পরিচয় ছিল। সিন্ধু ও তার পূর্ব দিকের উপনদীগুলি দিয়ে ঘেরা অঞ্চল ছিল আদি বৈদিক মানুষের বাসস্থান। ঐ অঞ্চলটিকে বলা হতো *সপ্তসিন্ধু* অঞ্চল।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনায় ঐ ভূগোল আস্তে আস্তে বদলে গিয়েছিল। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব এলাকার উল্লেখ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অনেক বেশি। এর থেকে বোঝা যায়, বৈদিক-বসতি পাঞ্জাব থেকে পূর্ব দিকে হরিয়ানাতে সরে গিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পূর্ব ভারতকে নীচু নজরে দেখা হয়েছে। তার থেকে মনে হয় পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার পূর্ব সীমা ছিল উত্তর বিহারের মিথিলা। গঙ্গা নদীর সমভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বৈদিক সমাজে কৃষির প্রচলন হয়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের মূল ভৌগোলিক অঞ্চল ছিল সিন্ধু ও গঙ্গার মাঝের এলাকা। তাছাড়া গঙ্গা উপত্যকার উত্তর ভাগ ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবও তার ভেতরে পড়ত।

বৈদিকযুগ ও প্রত্নতত্ত্ব

বৈদিক সাহিত্যে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের কথা স্পষ্ট। শেষদিকের রচনায় লোহার ব্যবহারের ধারণা পাওয়া যায়। ঘোড়া ছিল অন্যতম পালিত পশু। ঘোড়ায় টানা রথ ও তির-ধনুকের ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উপমহাদেশের হরপ্পার নাগরিক সভ্যতার অবসানের পরের প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ পাওয়া যায় বিভিন্ন স্থানে। সেগুলি সবই গ্রামীণ সভ্যতার পরিচয় দেয়। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে ঘোড়ার ও পরবর্তী পর্যায়ে লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মনে রেখো, আগের থেকে আলাদা কোনো নতুন সভ্যতার চিহ্ন মেলে না। একটা মিশ্র বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে একরকমের মাটির পাত্র বানানো হতো। সেই পাত্রগুলির রং ছিল ধূসর। সেগুলির

টুকরো কথা

মহাকাব্য

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের আরেকটি অংশ হলো **মহাকাব্য**। মহাকাব্য কথার মানে মহৎ বা মহান কাব্য বা কবিতা। কোনো বিশেষ ঘটনা, দেবতা বা বড়ো রাজবংশের শাসককে নিয়েই মহাকাব্য লেখা হতো। তার সঙ্গে থাকত ভূগোল, গ্রহ-নক্ষত্র ও গ্রাম-নগরের কথা। সমাজজীবনের নানা দিক, রাজনীতি, যুদ্ধ, উৎসবের কথাও মহাকাব্যের মধ্যে মিশে থাকত। সাতটি বা অন্তত আটটি সর্গ বা ভাগে ভাগ করা হতো মহাকাব্য। কবির, মূল ঘটনার বা কাব্যের প্রধান চরিত্রের নামে মহাকাব্যের নাম দেওয়া হতো। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সবথেকে জনপ্রিয় মহাকাব্য ছিল **রামায়ণ** ও **মহাভারত**।

উ

গন্ধার সমাধিস্থল
বুরজাহোম
ঘালিগাই
হেলমন্দ
ঝিলাম
চেনাব
বিয়াস
রোপার
রাভি
বানাওয়ালি
ভগবানপুরা
পানিপত
যমুনা
হস্তিনাপুর
সাটলেজ
পিরাক
সিন্ধু
বাহাওয়ালপুর
অহিচ্ছত্র
জাখেরা
শ্রাবস্তী
মথুরা
লাহুরদেব
দাদুপুর
চিরান্দ
আহড়
চম্বল
কৌশাম্বী
লক্ষ্নৌ
মলহার
গঙ্গা
বনস
রাজা-নল-কা-টিলা
মহিষদল
পাণ্ডুরাজার ঢিবি
নাগড়া
নর্মদা
তাপ্তি
মহানদী
ইনামগাঁও
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
গোদাবরী
ওয়াটগল
কৃষ্ণা
তুঙ্গভদ্রা
ব্রহ্মগিরি
হাল্লুর
কাবেরী
শ্রীলঙ্কা

▲ মেগালিথ প্রত্নকেন্দ্র
◻ ধূসর মাটির পাত্র প্রত্নকেন্দ্র
● লোহা প্রত্নকেন্দ্র

মানচিত্র ৪.১ :
ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০)

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

গায়ে ছবিও আঁকা হতো। এদের বলা হয় *চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্র*। হরিয়ানার ভগবানপুরায় (খ্রি:পূ: ১৬০০-খ্রি:পূ: ১০০০ অব্দ) লোহার ব্যবহারের আগের সময়ের প্রচুর পরিমাণে চিত্রিত ধূসর মাটির বাসন পাওয়া গেছে। এই মাটির পাত্র এলাহাবাদের পূর্বদিকে বিশেষ পাওয়া যায়নি। অত্রঞ্জিখেরা, হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র, নোহ প্রভৃতি জায়গাগুলোতে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পরের সময়ের মাটির বাসন ও লোহার ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। এছাড়াও অনেক জায়গায় প্রাচীন গ্রামের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। লোহার তিরের ফলা, বর্শার ফলা, আংটি, পেরেক, ছোরা, বঁড়শি, নানা ধরনের মাটির পাত্র, তামা-ব্রোঞ্জের গয়না, মাটির তৈরি মানুষ ও পশুর মূর্তি পাওয়া গেছে।

???

ভেবে দেখো

হরপ্পার মতো উন্নত পরিকল্পিত নাগরিক সভ্যতার পর বৈদিক গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ কী হতে পারে?

৪.৩ বৈদিক রাজনীতি
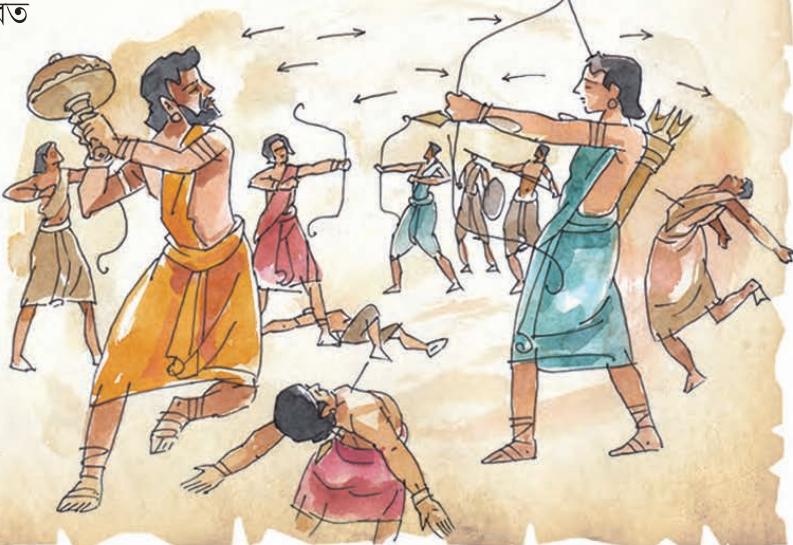
বৈদিক সাহিত্য মূলত ধর্মীয় সাহিত্য। কিন্তু তার থেকে সেই সময়ের রাজনীতি বিষয়ে বেশ কিছু কথা জানা যায়। ঋকবেদে যুদ্ধে জিতে লুঠপাট চালানোর জন্য দেবতার আশীর্বাদ চাওয়া হয়েছে। আবার পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শাসকদের জন্য বেশ কিছু যজ্ঞের কথাও রয়েছে। তবে রাজনীতির ঘটনার সরাসরি বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যে খুবই কম।

টুকরো কথা

দশ রাজার যুদ্ধ

যুদ্ধের কথা ঋকবেদে অনেক আছে। তার মধ্যে বিখ্যাত হলো **দশ রাজার যুদ্ধ**। ভরত গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন সুদাস। তার সঙ্গে অন্যান্য দশটি গোষ্ঠীর রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল। সুদাস দশ রাজার জোটকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ভরত গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়েছিল। নদীর ওপর একটি বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন সুদাস। হয়তো নদীর জলের উপর অধিকার বজায় রাখার জন্যই এমনটা করা হয়েছিল। এই যুদ্ধের সঙ্গে পরবর্তীকালে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুটা মিল রয়েছে।

টুকরো কথা

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজা

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের এক জায়গায় রাজা হওয়ার একটা গল্প আছে। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে প্রতিবারেই দেবতারা অসুরদের কাছে হেরে যেতেন। চিন্তায় পড়ে দেবতারা জেতার উপায় ঠিক করার জন্য বসেন আলোচনায়। বোঝা যায় কোনো রাজা না থাকার জন্যই দেবতাদের এই পরিণতি।

এবার দেবতারা রাজা খুঁজতে লাগলেন। সবাই একমত হয়ে দেবতাদের মধ্যে সেরা বীর ইন্দ্রকেই রাজা বাছলেন। ইন্দ্র দেখতেও বেশ ভালো ছিলেন। তাই সবাই তাকেই রাজা মেনে নিলেন। এবার কিন্তু দেবতারা ইন্দ্রের নেতৃত্বে জয়ী হতে থাকলেন।

■ উপরের গল্পটি পড়ে ভেবে বলো কেন রাজার দরকার হয়েছিল?

ঋকবেদে *গ্রাম* মানে শুধু গ্রামীণ বসতি নয়। একটি ছোটো জনসমষ্টিকেও *গ্রাম* বলা হয়েছে। আলাদা কয়েকটি পরিবার নিয়ে সম্ভবত ঐ ছোটো জনগোষ্ঠী বা গ্রাম তৈরি হতো। ঋকবেদে *জন, গণ, বিশ* প্রভৃতি শব্দ অনেকবার ব্যবহার হয়েছে। সেগুলি দিয়ে গ্রামের থেকে বড়ো একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হতো। ঋকবেদে যুদ্ধে জেতা ও লুঠপাটের নানান কথা রয়েছে। গবাদি পশু ও ঘোড়া লুঠ হতো সবথেকে বেশি।

ঋকবেদে *রাজা* শব্দের নানান রকম ব্যবহার রয়েছে। *রাজা* কথার আক্ষরিক অর্থ *নেতা*। নেতা যে ধরনের দায়িত্ব সামলাতেন তার ভিত্তিতেই ঠিক হতো তাঁর নাম। রাজাকে *বিশপতি* অর্থাৎ *বিশ* বা গোষ্ঠীর প্রধান বলা হয়েছে। কখনও বা রাজা *গোপতি* বা গবাদি পশুর প্রভু বলে পরিচিত। ঋকবেদে রাজা মানুষ ও জমির দখল পায়নি। তাই *নরপতি* বা *ভূপতি* শব্দগুলির ব্যবহার ঋকবেদে নেই। *বিদথ* নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কথা ঋকবেদে রয়েছে। রাজা ও বিশের সদস্যরা বিদথের সদস্য ছিলেন। সেখানে যুদ্ধের কথা আলোচনা হতো। আবার যুদ্ধে লুঠ করা সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারাও হতো। সেই ভাগাভাগির দায়িত্ব সামলাতেন রাজা। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজা শাসকে পরিণত হয়। তখন তিনি হলেন *ভূপতি* বা *মহীপতি*। ভূপতি হলেন ভূ অর্থাৎ জমির পতি বা মালিক। মহীপতি হলেন পৃথিবীর রাজা। রাজ্যের প্রজার বা জনগণের প্রধান হিসাবে রাজার উপাধি হলো *নৃপতি* বা *নরপতি*। অর্থাৎ যিনি *নৃ* বা *নর* অর্থাৎ মানুষের রক্ষাকারী। এভাবেই গোষ্ঠীর নেতা হয়ে উঠলেন রাজা। জনগণ পরিণত হলো তাঁর অনুগত প্রজায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজনৈতিক অবস্থা বদলে গিয়েছিল। *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে দেবতা ও অসুরদের লড়াই তারই উদাহরণ।

রাজা যে এলাকাটি শাসন করতেন তাকেই *রাজ্য* বলা হতো। পরবর্তী বৈদিক যুগে উপজাতি বা গোষ্ঠীর নামে অঞ্চলের নাম হতে থাকে। যেমন, কুরু, পাঞ্চাল ইত্যাদি। এভাবে অঞ্চল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ধারণা গড়ে ওঠে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর দখল থাকলে তবেই কেউ রাজা হতে পারত। ধরা হতো সেই অঞ্চলের মানুষেরা ঐ রাজার শাসন মেনে চলবে। শাসনকাজ চালানোর জন্য রাজার কিছু কর্মচারী থাকবে। আর থাকবে সেনাবাহিনী।

রাজার কথা এলেই *প্রজা*-র কথাও এসে পড়ে। রাজা যে অঞ্চলে শাসন করতেন সেখানকার বাসিন্দারাই তাঁর *প্রজা*। প্রজা না থাকলে রাজার শাসন চলবে না। প্রজাদের সমস্যা মেটাবেন রাজা। তার বিনিময়ে প্রজারা রাজাকে মেনে চলবে। এটাই ছিল সেকালের নিয়ম।

প্রাচীনকালে রাজা হওয়ার অনেক উপায় ছিল। কেউ যুদ্ধে জিতে রাজা হতেন। আবার কেউবা রাজার ছেলে হিসেবে পরবর্তী রাজা হতেন। কখনও বা গোষ্ঠীর সবাই মিলে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে রাজা হিসেবে বাছাই করত। রাজারা অনেক সময় পুরোহিতদের পরামর্শে নানান রকম যজ্ঞের আয়োজন করতেন। যেমন, *অশ্বমেধ যজ্ঞ*, *রাজসূয় যজ্ঞ*, *বাজপেয় যজ্ঞ* ইত্যাদি। যুদ্ধে যাওয়ার আগে কিছু যজ্ঞ হতো। যুদ্ধ জিতে ফিরে এসেও যজ্ঞ করতেন রাজারা। যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে রাজারা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে চাইতেন। শাসকদের জন্য নানারকম যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের কথা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে।

শাসনের কাজে সাহায্য করতেন যারা, তাদের *রত্নিন* বলা হতো। হয়তো এদের থেকেই পরে মন্ত্রীর ধারণা এসেছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে বিদথের কথা পাওয়া যায় না। তার বদলে *সভা* ও *সমিতি*র গুরুত্বের কথা জানা যায়। সভাতে বয়স্ক ব্যক্তিরা যোগ দিতেন। গোষ্ঠীর সবাই সম্ভবত সমিতির সদস্য ছিল। সমিতিতে নানারকম রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হতো।

বৈদিক সভ্যতার অর্থনীতি ও সমাজ

ঋকবেদে কৃষির তুলনায় পশুপালনের কথা বেশি পাওয়া যায়। আদি বৈদিক সমাজে গবাদি পশুই ছিল প্রধান সম্পদ। যার গবাদি পশু বেশি তিনি ধনী বলে পরিচিত হতেন। পশুপালনের ওপর সমাজ বেশি নির্ভর করত বলেই গবাদি পশুর এত গুরুত্ব ছিল। খেয়াল রাখা দরকার ঋকবেদে যুদ্ধ করে জমি দখলের কথা বিশেষ নেই। কারণ ঋকবেদের যুগে সম্পদ হিসাবে জমির গুরুত্ব বিশেষ ছিল না। তাছাড়া ঘোড়ার চাহিদাও ছিল সম্পদ হিসাবে। আদি বৈদিক যুগে কৃষির প্রসঙ্গ কম হলেও, ছিল। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে যব ছিল প্রধান। গম ও ধান উৎপাদন হতো কিনা তা নিশ্চিত বলা যায় না। আস্তে আস্তে বৈদিক সমাজে কৃষির গুরুত্ব বাড়ছিল।

আদি বৈদিক সমাজে কারিগরি শিল্পের চল ছিল কম। কাঠের কারিগরি শিল্পের কথা জানা যায়। কাঠের আসবাব ও বাড়িঘর তৈরি করা হতো। তাছাড়া রথ তৈরি করতেও কাঠ ব্যবহার হতো। ঋকবেদে চামড়ার শিল্পের কথা রয়েছে। চামড়া দিয়ে থলি, ঘোড়ার লাগাম প্রভৃতি বানানো হতো। ভেড়ার লোম থেকে পোশাক বানানোর কথা ঋকবেদে রয়েছে। টানা ও পোড়েন— দু-রকমের সুতো কাপড় বোনায় ব্যবহার হতো। সোনার নানারকম গয়নার কথাও ঋকবেদ থেকে জানা যায়। তামা দিয়ে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বানানো হতো। ঋকবেদে লোহার কথা নেই। ফলে আদি বৈদিক সমাজে লোহার ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না।

টুকরো কথা

বেদের যুগে কর দেওয়া-নেওয়া

গোষ্ঠীজীবনে প্রথম দিকে জমির উপর নেতার কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু নেতৃত্ব চালানোর জন্য তাঁর ধনসম্পদের দরকার ছিল। তা সম্ভবত কৃষি থেকেই পেতেন শাসকরা। ঋকবেদের যুগে শাসকরা কর নিতেন। তবে জোর করে করের বোঝা প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো না। প্রজারা নিরাপদে থাকার জন্য স্বেচ্ছায় এক ধরনের কর রাজাকে দিত। ঋকবেদে এই করই **বলি** নামে পরিচিত। তবে পরবর্তী বৈদিক যুগে দলপতি সম্ভবত জোর করে বলি কর আদায় করতেন। অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে কর হয়ে উঠেছিল বাধ্যতামূলক। যুদ্ধে যাঁরা হেরে যেত তাঁদের থেকেও রাজারা জোর করে কর আদায় করতেন।

পরবর্তী বৈদিক যুগে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে পাকাপাকি কৃষিকাজ শুরু হয়। এই সময় যবের পাশাপাশি গম ও ধান ছিল প্রধান ফসল। কোন ঋতুতে কোন ফসল ফলানো উচিত, তা নিয়েও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আলোচনা দেখা যায়। লাঙলের ফলা সাধারণত কাঠ বা তামা দিয়ে তৈরি হতো। লোহার লাঙল সম্ভবত তখনও ব্যবহার হতো না।

গঙ্গা অববাহিকায় কৃষিকাজ ও বসতি তৈরির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা ছিল দরকারি। সম্ভবত বন পুড়িয়ে ফেলা হতো। আবার লোহার অস্ত্র দিয়ে বন কেটে ফেলাও হতো হয়তো। পরবর্তী বৈদিক সমাজে লোহার ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই হতো। লোহার কুড়াল ও কুঠার দিয়ে গঙ্গা উপত্যকার ঘন জঙ্গল সাফ করা সহজ হয়েছিল। লোহার তৈরি লাঙলের ফলা না থাকলেও অস্ত্রশস্ত্র লোহা দিয়েই তৈরি হতো। লোহার অস্ত্র পরবর্তী বৈদিক যুগের শাসকদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

লোহা ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার কারিগরি শিল্পে উন্নতি ঘটিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগের চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন। তার থেকে বোঝা যায় পরবর্তী বৈদিক সমাজে কুমোরের পেশা ছিল। তাছাড়া এসময় কামার, জেলে, রাখাল, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার কথা জানা যায়। গয়না, অস্ত্রশস্ত্র, কাপড় তৈরির শিল্প চালু ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে কাজের ভাগাভাগি অনেক বেড়ে গেছিল। এমনকি একটি জিনিস বানাতেও আলাদা আলাদা অংশের কারিগর থাকত। যেমন, ধনুক, ধনুকের ছিলা এবং তির তৈরির আলাদা কারিগর ছিল।

আদি বৈদিক যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ চলন ছিল না। সরাসরি সমুদ্র-বাণিজ্যের কথা ঋকবেদে নেই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বেশি পাওয়া যায়। তবে সমুদ্র-বাণিজ্য এই আমলেও ছিল কিনা নিশ্চিত জানা যায় না। বৈদিক যুগে জিনিসপত্র বিনিময় করা হতো। তবে মুদ্রার ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না। যদিও *নিষ্ক, শতমান* এগুলি হয়তো মুদ্রার মতো ব্যবহার হতো।

বৈদিক সাহিত্য থেকে ঐ সময়ে সমাজের কথাও জানা যায়। সমাজের সবথেকে ছোটো অংশ ছিল পরিবার। পরিবারের সবথেকে বয়স্ক পুরুষ ছিলেন প্রধান। তাই বৈদিক যুগে সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ পরিবারে ও সমাজে পিতা বা বাবাই ছিলেন প্রধান। হরপ্পার সমাজের মতো মায়ের ক্ষমতা ঋকবৈদিক সমাজে ছিল না।

ঋকবেদে গোড়ার দিকে *বর্ণাশ্রম* বা *চতুর্বর্ণপ্রথা* বিশেষ ছিল বলে জানা যায় না। চারটি বর্ণ বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা ঋকবেদে পাওয়া যায় না। বরং মনে হয় ঋকবেদে *বর্ণ* বলতে গায়ের রংকেই বোঝাত। বর্ণাশ্রম বোঝাতে বর্ণ শব্দের ব্যবহার আদি বৈদিক সমাজে ছিল না। ঋকবেদের সমাজে সামাজিক ভেদাভেদ ছিল। তবে তা বর্ণপ্রথা দিয়ে বিচার করা হতো না। একই পরিবারের সদস্যরা নানা কাজে যুক্ত থাকতেন। ঋকবেদের থেকে এমন একটি পরিবারের কথা জানা যায়। সেখানে বাবা চিকিৎসক, মা শস্য পেশাই করতেন এবং তাদের ছেলে ছিলেন কবি।

ঋকবেদের শেষের দিকে বর্ণাশ্রম প্রথা বোঝাতে বর্ণ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক সমাজে বর্ণপ্রথা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। সেখানে বর্ণ বলতে আর গায়ের রং বোঝাত না। পরবর্তী বৈদিকযুগে চারটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারবর্ণকে জন্মগত ধরে নিয়ে পেশা ঠিক করা শুরু হতে থাকে। তার থেকেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি বলে অনেকে মনে করেন।

পুজো, যজ্ঞ, বেদ পাঠ ইত্যাদি করতেন ব্রাহ্মণরা। যুদ্ধ করা, সম্পদ লুঠ করার কাজ ছিল ক্ষত্রিয়দের। কারিগরি, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যদের কাজ। এই তিনবর্ণের সেবা করত শূদ্ররা। যুদ্ধবন্দি দাসরাই মূলত শূদ্র ছিল। পরবর্তী বৈদিক আমলে জটিল যাগযজ্ঞ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে বেড়েছিল ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাও। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যগুলি ব্রাহ্মণরাই লিখেছিলেন। সেগুলিতে তাই ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ঠিক পরেই ছিল ক্ষত্রিয়রা। পরবর্তী বৈদিক সমাজে কৃষিকাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেই সমাজে ক্ষত্রিয়রা আস্তে আস্তে শক্তিশালী হতে থাকে। এমনকি কে বড়ো, তা নিয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গোলমাল বাঁধতে শুরু করে।

পরবর্তী বৈদিক সমাজে বৈশ্য ও শূদ্রদের অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপ হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বৈশ্যদের হেয় করে দেখানো হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার সবথেকে খারাপ প্রভাব পড়েছিল শূদ্রদের উপর। তাদের কোনো সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রায় ছিল না।

টুকরো কথা

সত্যকামের কথা

সত্যকাম তার বাবার পরিচয় জানত না। পড়াশোনার জন্য গুরুর কাছে গেলে গুরু তার গোত্র জানতে চান। সত্যকাম তার মা জবালাকে নিজের গোত্র জানতে চাইলো। জবালা বললেন, 'আমি তা জানি না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলবে যে, তুমি সত্যকাম জাবাল।'

সত্যকাম গুরু গৌতমের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি আমার গোত্র জানি না। আমার মা বললেন আমার নাম সত্যকাম জাবাল'। গৌতম বললেন, 'তুমি সত্য কথা বলেছো। তাই তোমাকে আমি শিক্ষাদান করব।'

■ ব্রাহ্মণের প্রকৃত পরিচয় কী ছিল? এই অবস্থার কখন কেন পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়?

মনে রেখো

গোষ্ঠীর গবাদিপশু রাখার জায়গাকে বলা হতো **গোত্র**। পরে গোত্রের মানে দাঁড়ায় একই পূর্বপুরুষ থেকে আসা উত্তরাধিকারী। জাতিভেদ প্রথা কঠোর হওয়ার ক্ষেত্রে গোত্রের জরুরি ভূমিকা ছিল।

টুকরো কথা

চতুরাশ্রম

পরবর্তী বৈদিক যুগে জীবনযাপনের চারটি ভাগ বা পর্যায় ছিল। *ব্রহ্মচর্য*, *গার্হস্থ্য*, *বাণপ্রস্থ* এবং *সন্ন্যাস*। ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করা ছিল *ব্রহ্মচর্যাশ্রম*। শিক্ষালাভের পর বিয়ে করে সংসার জীবন যাপনকে বলা হতো *গার্হস্থ্যাশ্রম*। *বাণপ্রস্থা-শ্রম* বলা হতো সংসার থেকে দূরে বনে কুটির বানিয়ে ধর্মচর্চা করাকে। সবকিছু ভুলে ঈশ্বরচিন্তায় শেষ জীবন কাটানোকে বলা হতো *সন্ন্যাস আশ্রম*। এই চারটি পর্যায়কে একসঙ্গে *চতুরাশ্রম* বলা হতো। শূদ্রদের এই জীবনযাপনের অধিকার ছিল না।

আদি বৈদিক সমাজে অনেক নারী শিক্ষা লাভ করতেন। এমনকি সমিতির বৈঠকেও কিছু নারী যোগ দিতেন বলে জানা যায়। যুদ্ধেও তারা অংশ নিতেন। ঋকবেদে কোথাও বাল্যবিবাহের কথা নেই। সতীদাহ প্রথার কথাও সেখানে পাওয়া যায় না। যজ্ঞেও নারীরা অংশ নিতে পারতেন।

পরবর্তী বৈদিক সমাজে নারীদের অবস্থাও খারাপ হয়েছিল। মেয়ে জন্মালে পরিবারে সবাই দুঃখ পেত। ছোটো বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রথা শুরু হয়েছিল। যুদ্ধে বা সমিতির কাজে মেয়েদের আর যোগ দিতে দেখা যেত না।

বৈদিক সমাজে পাশাখেলা ছিল খুব জনপ্রিয়। সভা ও সমিতিতেও পাশা খেলা হতো। রথ ও ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষ ভিড় করত। গানবাজনারও প্রচলন ছিল বৈদিক সমাজে। যব, গম ও ধান ছিল প্রধান খাদ্যশস্য। আদি বৈদিক সমাজে নানারকম মাংস খাওয়ারও প্রচলন ছিল।

টুকরো কথা

বৈদিক সমাজ ও ধর্ম

বৈদিক যুগে মূর্তি পুজো প্রচলিত ছিল না। কিন্তু দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করা হতো মানুষের মতন। কোনো মন্দিরের উল্লেখ নেই বৈদিক সাহিত্যে। ধর্মচর্চা মূলত ছিল আচার অনুষ্ঠান নির্ভর এবং যজ্ঞকেন্দ্রিক। যজ্ঞে গোরু, ঘোড়া ইত্যাদি পশু বলি দেওয়া হতো। ঋকবেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি সূর্য, মিত্র, অশ্বিনীদ্বয়, সোম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ঊষা, সরস্বতী, অদিতি, পৃথিবী প্রভৃতি ছিলেন উল্লেখযোগ্য দেবী। যুদ্ধের ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ঋকবৈদিক যুগের প্রধান দেবতা। সূর্যদেবতা সবিতৃ-র উদ্দেশ্যে গায়ত্রী মন্ত্র রচিত হয়েছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে রুদ্র ও বিষ্ণু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠান অনেক গুণ বেড়ে যায়। যজ্ঞে অনেক পশু হত্যা করা হতো। যজ্ঞে দান করা হতো পশু, সোনা ও জমি। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা এভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে ধর্মীয় আচার-নিয়মের জন্য। বৈদিক ধর্ম ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের রূপ নিতে লাগল। তবে উপনিষদে নিরাকার এক-ঈশ্বরের ভাবনা পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের শিক্ষা
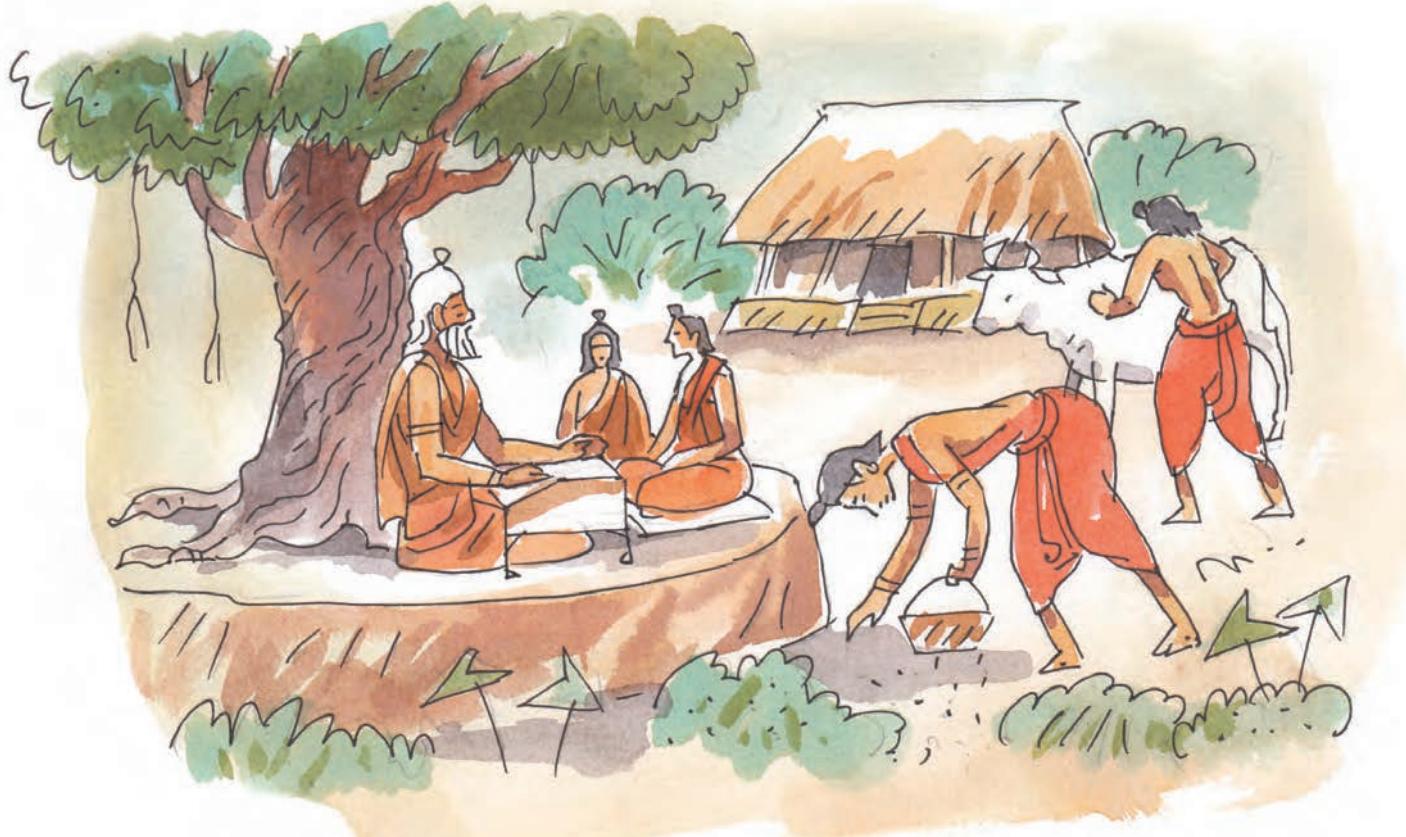
বৈদিক সাহিত্য থেকেই সেই যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা আমরা পাই। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন গুরু। মৌখিকভাবেই শিক্ষার চর্চা হতো। গুরু একটা অংশ পড়ে তার মানে বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্ররা সেই পুরোটা শুনে আবৃত্তি করত ও মনে রাখত। মুখস্থ করার ক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হতো। বৈদিক যুগের কোনো লিপির খোঁজ প্রত্নতাত্ত্বিকরা পাননি।

পরবর্তী বৈদিক যুগে শিক্ষার সঙ্গে উপনয়নের সম্পর্ক দেখা যায়। ছাত্র শিক্ষা নেওয়ার জন্য গুরুর কাছে আবেদন করত। উপযুক্ত মনে করলেই উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গুরু সেই ছাত্রকে শিষ্য হিসেবে মেনে নিতেন। মেয়েদেরও যে উপনয়ন হতো তারও বেশ কিছু প্রমাণ দেখা যায়। গুরুর কাছে থেকেই ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করত। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কাজকর্মও ছাত্রদের করতে হতো। ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব ছিল গুরুর উপরে।

টুকরো কথা

বৈদিক পড়াশোনা ও শ্রুতি

বৈদিক সাহিত্য মূলত শুনে শুনে মনে রাখতে হতো। তাই বেদের আরেক নাম **শ্রুতি**। ঋকবেদে *ভেকস্তুতি* বলে একটা অংশ আছে। সেখানে বলা আছে একটি ব্যাং ডাকলে অন্যান্য ব্যাং তার মতোই ডাকতে থাকে। ঠিক তেমনি ঋকবেদের সূক্তগুলি মনে করে গুরু বা একজন শিক্ষার্থী আবৃত্তি করত। বাকিরা শুনেশুনে মনে রেখে সেটাই নিখুঁতভাবে বলত। সেকারণে নির্ভুল উচ্চারণ করে বৈদিক মন্ত্রগুলি বলার দক্ষতা অর্জন করতে হতো। তাই **ছন্দ ও ব্যাকরণ** বৈদিক শিক্ষার দুটি প্রধান বিষয় ছিল।

টুকরো কথা

আরুণির কথা

মহর্ষি আয়োদধৌম্য ছিলেন একজন আদর্শ গুরু। তাঁর তিনজন বিখ্যাত ছাত্র ছিল। বেদ, উপমন্যু ও আরুণি। গুরুভক্তি পরীক্ষা করার জন্য আয়োদধৌম্য তাঁর শিষ্যদের নানা কঠিন কাজ দিতেন। একদিন তিনি আরুণিকে ক্ষেতের জল বের হওয়া জায়গায় আল বাঁধতে বললেন। আরুণি আল বাঁধার অনেক চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ক্ষেতের সব জল ঐ জায়গা দিয়েই বার হয়। তাই আল বাঁধা মুশকিল হলো। এদিকে গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণিকে জলস্রোত আটকাতে হবেই। তখন আরুণি নিরুপায় হয়ে আলের উপর নিজে শুয়ে পড়ল। সেভাবেই নিজের শরীর দিয়ে জলস্রোত আটকে রাখতে চেষ্টা করল। আরুণির ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে মহর্ষি তার খোঁজে ক্ষেতে এসে পৌঁছোলেন। গুরুর ডাক শুনে আরুণি ক্ষেত থেকে উঠে গেল। আয়োদধৌম্য আরুণির মুখে সব শুনে শিষ্যের গুরুভক্তিতে খুব খুশি হলেন। ক্ষেতের আল বা কেদারখণ্ড ভেদ করে আরুণি উঠে এসেছিল বলে মহর্ষি তার নাম দিলেন উদ্দালক। উদ্দালক নিজেও পরে খুব বিখ্যাত গুরু হয়েছিলেন।

বেদপাঠ করানোর মধ্যে দিয়েই শিক্ষাদান করা হতো। তার সঙ্গে গণিত, ব্যাকরণ ও ভাষাশিক্ষার উপরও জোর দেওয়া হতো। হাতেকলমে অনেক কিছুই শিখতে হতো। ছাত্রদের নিজেকে রক্ষা করা ও অস্ত্রচালানো শিখতে হতো। এমনকি ব্রাহ্মণরাও অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করত। যেমন, *মহাভারত* থেকে দ্রোণাচার্য, কৃপ, পরশুরামের কথা জানা যায়। ছাত্ররা চিকিৎসা করা শিখত। মেয়েরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নাচ ও গানের চর্চা করত।

???

ভেবে দেখো

তোমরা পড়াশোনার সঙ্গে হাতেকলমেও কি কাজ শেখো? হাতেকলমে কী কী শিখেছ?

সাধারণত বারো বছর ধরে শিক্ষা গ্রহণ চলত। অনেকে আবার জীবনভরই ছাত্র থাকত। এমনিতে বারো বছরের পড়াশোনা শেষ হলে *সমাবর্তন* অনুষ্ঠান হতো। সেই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের *স্নাতক* বলে ঘোষণা করা হতো। পড়াশোনার শেষে ছাত্রদের বিশেষ স্নান করার প্রথা ছিল। তার থেকেই *স্নাতক* কথাটা এসেছে। গুরুগৃহ ছেড়ে চলে যাবার আগে ছাত্ররা সাধ্যমতো গুরুদক্ষিণা দিত। গুরুদক্ষিণা হিসাবে গোরুদান করার কথা জানা যায়।

টুকরো কথা

একলব্য

ভিলদের রাজা ছিলেন হিরণ্যধনু। তাঁর একমাত্র ছেলের নাম একলব্য। একলব্য খুবই সাহসী ও পরিশ্রমী। একলব্যের ইচ্ছা হলো সে তির ছুঁড়তে শিখবে। সে শুনেছে গুরু দ্রোণাচার্য খুব বড়ো অস্ত্র-শিক্ষক।

ঘরে ফিরে বাবাকে দ্রোণাচার্যের বিষয়ে জানতে চাইল একলব্য। হিরণ্যধনু বললেন, ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য শুধু ক্ষত্রিয় বালকদেরই অস্ত্র শিক্ষা দেন। ভিল বালককে কিছুতেই আচার্য দ্রোণ নিজের শিষ্য করবেন না। সেকথা শুনে একলব্য বলল, তির ছোঁড়া শুধু আচার্য দ্রোণের কাছেই শিখব।

দ্রোণের কুটিরে গিয়ে একলব্য তাঁকে প্রণাম করে তারপরে নিজের পরিচয় দিল। দ্রোণকে বলল, আপনার কাছে তির ছোঁড়ার শিক্ষা নিতে এসেছি। আমায় আপনার শিষ্য করে নিন গুরুদেব। দ্রোণ ভালো করে বুঝিয়েই বললেন, আমি তোমাকে শিষ্য করতে পারব না। আমি শুধু ক্ষত্রিয়দেরই অস্ত্র-শিক্ষা দিই। তুমি ভিলকুমার। ঘরে ফিরে যাও।

টুকরো কথা

বৈদিক পড়াশোনা ও বিজ্ঞানচর্চা

বৈদিক শিক্ষায় গণিতের চর্চা হতো। যজ্ঞবেদি বানানোর জন্য জ্যামিতির জ্ঞান প্রয়োজন হতো। যজ্ঞবেদির ইট পোড়ানো হতো। ঠিক মতো ইট বানানো ও পোড়ানোর দায়িত্ব পড়ত ইটের কারিগরদের ওপর। আর যজ্ঞবেদি বানাত মিস্ত্রি আর স্থপতিরা। ফলে স্থপতিদের হাতেই বৈদিক গণিতচর্চা শুরু হয়েছিল। যজ্ঞের বেদি তৈরিতে শ্রমিক, ছুতোর, গণিতবিদদের দরকার হতো। তবে ঋকবেদে ইটের কথা নেই। সেকথা প্রথম পাওয়া যায় যজুর্বেদে। যজ্ঞের বেদি তৈরির জন্য বিভিন্নরকম যন্ত্রের ব্যবহার হতো। যজ্ঞ করার জন্য গ্রহ-নক্ষত্র ও কাল, ঋতুর সঠিক ধারণা দরকার ছিল। সেই চর্চা থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জানা-বোঝা শুরু হয়। অথর্ববেদের একটা অংশে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়েও আলোচনা দেখা যায়।

খুব মন খারাপ হয়ে গেল একলব্যর। দ্রোণের কুটির থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে ফিরল না। জঙ্গলে গিয়ে সে মাটি দিয়ে আচার্য দ্রোণের একটা মূর্তি তৈরি করল। আর একাই ঐ মূর্তির সামনে তির ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল। একটানা অভ্যাস চালিয়ে গেল একলব্য। এভাবে অনেকদিন পর সে সত্যিই বিরাট তিরন্দাজ হয়ে উঠল।

একদিন সেই মূর্তির সামনে একলব্য তির ছোঁড়া অভ্যাস করছে। হঠাৎ একটা কুকুরের চিৎকারে তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তির ছুঁড়ে কুকুরটার মুখ আটকে দিল একলব্য। সেই অবস্থায় কুকুরটা দৌড়ে চলে গেল কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের কাছে। কুকুরের অবস্থা দেখে তারা বুঝল এভাবে তির মারা আশ্চর্যের ব্যাপার। অর্জুনও এত অসাধারণ তির ছুঁড়তে পারে না। দ্রোণাচার্য চমকে উঠলেন কুকুরটাকে দেখে। তিনি মনে মনে ঐ তিরন্দাজের তারিফ করলেন।

কিছুদূর গিয়েই দ্রোণ দেখলেন একলব্য তির ছোঁড়া অভ্যাস করছে। তিনি একলব্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার গুরু কে? একলব্য জানাল, আচার্য দ্রোণ আমার গুরু। তখন একলব্য সবাইকে দ্রোণাচার্যের মূর্তিটা দেখাল। দ্রোণ একলব্যের পরিশ্রম ও শেখার আগ্রহ দেখে খুবই খুশি হলেন। অথচ অর্জুনকে তিনি কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাকেই পৃথিবীর সেরা ধনুর্ধারী বানাবেন। কিন্তু একলব্য অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিজের কথার খেলাপ হবে ভেবে দ্রোণ একটা উপায় ঠিক করলেন।

একলব্যকে বললেন, তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা হিসাবে কী দেবে? একলব্য বলল, আপনি যা চাইবেন তাই দেবো। দ্রোণ বললেন, তবে তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আমায় দাও। নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে দ্রোণকে দিয়ে দিল একলব্য।

এরপর একলব্য তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল ছাড়াই তির ছুঁড়তে শিখেছিল। তবু আগের মতো সে আর তির ছুঁড়তে পারতো না। একলব্যের কথা মহাভারতে আছে। মহাভারত পরবর্তী বৈদিক যুগের রচনা।

৪.৪ বৈদিক যুগে অন্যান্য সমাজ

পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বৈদিক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েনি। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চলেই বৈদিক বসতি ছিল। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে বৈদিক সভ্যতা ছিল না। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ঐসময়ে অন্যরকম সংস্কৃতির খোঁজ পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। সেই সংস্কৃতিগুলিতে মানুষ পাথর ও তামার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। কালো ও লাল রঙের মাটির পাত্র তারা ব্যবহার করত। মাটির তৈরি ভাঙা বাড়িঘরও খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। পশ্চিমবঙ্গে মহিষদলে তেমনই একটি সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া গেছে। সেখানে গ্রামীণ কৃষিসমাজ ছিল বলে জানা যায়। তারা মৃতদেহকে সমাধি দিত। এমনই একটি সমাজের খোঁজ পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রের ইনামগাঁওতে।

???

ভেবে দেখো

লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে কী কী বদল ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়?

মেগালিথ

মেগালিথ হলো বড়ো পাথরের সমাধি। প্রাচীন ভারতে লোহার ব্যবহারের সঙ্গে এই সমাধির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের সমাধি চিহ্নিত করত। বড়ো পাথর দিয়ে চিহ্নিত এই সমাধিগুলোর নানা রকমফের দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা বড়ো একটি পাথর। কোথাও বৃত্তাকারে সাজানো অনেক পাথর। কোথাও অনেকগুলো পাথর ঢাকা দেওয়া রয়েছে একটা বড়ো পাথর দিয়ে। কোথাওবা পাহাড় কেটে বানানো গুহার ভেতর সমাধি। এইসব সমাধিগুলো থেকে মানুষের কঙ্কাল ও তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। কাশ্মীরের বুরজাহোম, রাজস্থানের ভরতপুর, ইনামগাঁও বিখ্যাত মেগালিথ কেন্দ্র। তবে এই বড়ো পাথরের সমাধিগুলো বেশি পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতে। এইসব জায়গায় কালো বা লাল মাটির বাসন, পাথর, পোড়ামাটির তৈরি জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া লোহা, সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জের জিনিসও রয়েছে। ঘোড়া ও অন্যান্য জীবজন্তুর হাড়, মাছের কাঁটা ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। ব্যবহার করা জিনিসের তফাত থেকে বোঝা যায় ঐসব সমাজে ধনী-দরিদ্র ভাগ ছিল। জানা যায় যে, কোনো কোনো জায়গায় একসঙ্গে একটি পরিবারের সমাধি দেওয়া হতো।

ছবি. ৪.১: একটি মেগালিথ

মনে রেখো

ছোটোনাগপুরে মুন্ডা, আসামে খাসিদের মধ্যে মেগালিথ ব্যবস্থা এখনও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, হুগলি ও পুরুলিয়ায় এমন সমাধিক্ষেত্র দেখা যায়।

টুকরো কথা

এক নজরে ইনামগাঁও

- ✶ মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার একটি প্রত্নক্ষেত্র। একটি মেগালিথ কেন্দ্র।
- ✶ ভীমা নদী উপত্যকার এই কেন্দ্রে খ্রি:পূ: ১৪০০ থেকে খ্রি:পূ: ৬০০ অব্দ সময়কালের মানুষের বাস ছিল।
- ✶ কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যশিকার ছিল তাদের প্রধান জীবিকা।
- ✶ আয়তাকার প্রায় ১৩৪ টি ঘরের খোঁজ পাওয়া গেছে।
- ✶ ৬ মিটার চওড়া, ৪২০ মিটার লম্বা একটি সেচখালের অবশেষ পাওয়া গেছে।
- ✶ গম, যব, ডাল ও ধান ছিল প্রধান উৎপন্ন খাদ্যশস্য।
- ✶ বাড়িতে শস্য মজুত রাখার জালা, আগুন জ্বালাবার গর্ত পাওয়া গেছে। বাড়ির লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রও পাওয়া গেছে।
- ✶ দামি পাথরের হার পরা দু-বছরের বাচ্চা মেয়ের সমাধি পাওয়া গেছে।
- ✶ পাত্রের গায়ে পাওয়া গেছে ষাঁড়ে টানা গাড়ির ছবি।
- ✶ মাথাসমেত ও মাথা ছাড়া দুটি দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে।
- ✶ প্রতিটি বাড়িতেই মাটির পাঁচিল, মাংস ঝলসাবার জন্য উনুন ছিল।
- ✶ শেষপর্বে আয়তাকার বাড়ির বদলে ছোটো গোলাকার কুঁড়ে তৈরি হতে থাকে।
- ✶ কালো ও লাল মাটির বাসনপত্র, লোহার জিনিস ইত্যাদি পাওয়া গেছে।
- ✶ পরের দিকে ঘোড়ার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।
- ✶ পাঁচটি ঘরওলা একটি বড়ো বাড়িতে উত্তরে মাথা করা একটি সমাধি পাওয়া গেছে। হয়তো সেটা ছিল গোষ্ঠীপতির সমাধি।

ছবি. ৪.২: মেগালিথ কেন্দ্র

ভেবে দেখো   খুঁজে দেখো

১। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

১.১) আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার প্রধান উপাদান— (জেন্দ অবেস্তা/মহাকাব্য/ঋকবেদ)।

১.২) মেগালিথ বলা হয়— (পাথরের গাড়ি/পাথরের সমাধি/পাথরের খেলনা) কে।

১.৩) ঋকবেদে রাজা ছিলেন—(গোষ্ঠীর প্রধান/রাজ্যের প্রধান/সমাজের প্রধান)।

১.৪) বৈদিক সমাজে পরিবারের প্রধান ছিলেন — (রাজা/বিশপতি/বাবা)।

২। বেমানান শব্দটি খুঁজে লেখো :

২.১) ঋকবেদ, মহাকাব্য, সামবেদ, অথর্ববেদ

২.২) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, নৃপতি

২.৩) ইনামগাঁও, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী

২.৪) ঊষা, অদিতি, পৃথিবী, দুর্গা

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৩.১) বেদ শুনে শুনে মনে রাখতে হতো। এর কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৩.২) বৈদিক সমাজ চারটি ভাগে কেন ভাগ হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

৩.৩) বৈদিক যুগের পড়াশোনায় গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক কেমন ছিল বলে মনে হয়?

৩.৪) আদি বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থার কি কোনো বদল হয়েছিল? বদল হয়ে থাকলে কেন তা হয়েছিল বলে মনে হয়?

৪। হাতেকলমে করো :

৪.১) বৈদিক সমাজে রাজার ধারণার বদল একটি চার্টের সাহায্যে দেখাও।

৪.২) বৈদিক সমাজে জীবিকাগুলির একটি চার্ট তৈরি করো।

৫

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ

রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বিবর্তন - উত্তর ভারত

একটু থেমে রুবির দাদু জানতে চাইলেন, তোমরা রূপকথার গল্প নিশ্চয়ই পড়েছ? আজ দাদু ওদের রূপকথার গল্প শোনাচ্ছেন। যদিও ওরা ক্লাস সিক্সে পড়ে, তবুও রূপকথার গল্প শোনার মজাই আলাদা। কত রাজা, রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যা। সঙ্গে আছে পক্ষীরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ। সবমিলিয়ে বেশ জমজমাট। কিন্তু রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে পলাশের মনে একটা ভাবনা আসে। রূপকথায় রাজার নাম থাকে না। সেই রাজা *কবে*, *কোথায়* ছিলেন তাও বলা থাকে না। দিদিমণি বলেছিলেন, রূপকথা ইতিহাস নয়। পলাশের খুব জানতে ইচ্ছা করে ইতিহাসের রাজা-রানিদের কথা। পরদিন ক্লাসে সেই ইচ্ছার কথাই জানাল পলাশ। দিদিমণি বললেন, বেশ তো, এবারে তাহলে রাজার কথাই হোক।

৫.১. জনপদ থেকে মহাজনপদ

প্রাচীন ভারতে গ্রামের থেকে বড়ো অঞ্চলকে *জন* বলা হতো। সেই *জন*-কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল ছোটো ছোটো রাজ্য। এইভাবে *জন* শব্দ থেকেই *জনপদ* শব্দটি এসেছিল। আরেক দিক থেকে সাধারণ মানুষ বা জনগণ যেখানে বাস করত তাকে বলা হতো *জনপদ*। অর্থাৎ জনগণ যেখানে পা বা *পদ* রাখেন, সেটাই *জনপদ*। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণ পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকলে তা *জনপদ* হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে এইরকম অনেকগুলি জনপদের কথা জানা যায়। সেসব জনপদগুলি অনেক সময়েই পরিচিত হতো সেখানকার শাসক বংশের নামে। ঐ জনপদগুলিকে ভিত্তি করেই পরের দিকে বড়ো বড়ো রাজ্য তৈরি হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে এরকম জনপদের খোঁজ পেয়েছেন। মগধের মতো কয়েকটি জনপদ আস্তে আস্তে মহাজনপদে পরিণত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ একেকটা জনপদের ক্ষমতা ক্রমে বাড়তে থাকে। সেখানকার শাসকরা যুদ্ধ করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে থাকেন। ছোটো ছোটো জনপদগুলির কয়েকটি পরিণত হয় বড়ো রাজ্যে। এই বড়ো রাজ্যগুলিই *মহাজনপদ* বলে পরিচিত হয়। জনপদের থেকে যা আয়তন ও ক্ষমতায় বড়ো তাই *মহাজনপদ*। মহাজনপদগুলির শাসকরা ছিলেন বৈদিক যুগের রাজাদের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁদের হাতে অনেক সম্পদ জমা হলো। সেই সম্পদ ব্যবহার করে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা আরো বাড়াতে চাইলেন। ফলে প্রায়শই লেগে থাকত যুদ্ধ।

ষোড়শ মহাজনপদ

জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও জনপদ-মহাজনপদের আলোচনা পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে ষোলোটি মহাজনপদের কথা জানা যায়। সেইসময়ে এদেরকে একসঙ্গে *ষোড়শ মহাজনপদ* বলা হতো। মহাজনপদগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। একে অন্যের রাজ্য জয় করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে চাইত। এইভাবে ক্রমে ষোলোটা মহাজনপদ কমতে কমতে চারটে মহাজনপদে এসে দাঁড়াল। এগুলি হলো অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। এই চারটে মহাজনপদ আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করত। তাদের মধ্যে শেষপর্যন্ত মগধ হয়ে ওঠে সবথেকে বেশি শক্তিশালী।

ষোলোটি মহাজনপদের বেশিরভাগই ছিল আজকের মধ্য ও উত্তর ভারত অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহাজনপদ ছিল অস্মক। মানচিত্র (৫.১) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাকে ভিত্তি করেই বেশিরভাগ মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল। গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চল ছিল সেই সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনীতির মূল কেন্দ্র।

বিরাট গঙ্গা উপত্যকা ছিল একটি সমতল অঞ্চল। ফলে রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বাধা ছিল না। যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়ার ফলে পলিমাটির জমি ছিল উর্বর। চাষ হতো খুবই ভালো। পাশাপাশি গভীর বনও ছিল। বনে কাঠ থেকে হাতি সবই পাওয়া যেত। নদীপথে যাতায়াত করারও সুবিধা ছিল। এসবের ফলেই ঐ অঞ্চলের মহাজনপদগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

মহাজনপদের শাসন ব্যবস্থা

অধিকাংশ মহাজনপদেই ছিল রাজার শাসন। সেই মহাজনপদগুলিকে বলা হতো রাজতান্ত্রিক রাজ্য। রাজতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে উপরে ছিলেন রাজা। রাজা বিশেষ কোনো বংশের সদস্য ছিলেন। সেই বংশই বছরের পর বছর রাজত্ব করত। একসময়ে তাদের হারিয়ে অন্য বংশের কেউ আবার রাজা হতেন। শাসনের কাজে রাজাকে সাহায্য করত একটি সভা। তার সদস্যরা রাজাকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। রাজ্যগুলিতে জমি জরিপ করে কর সংগ্রহ করা হতো। কর থেকে পাওয়া টাকায় রাজ্যের শাসন কাজের খরচ চলত।

এরকম একটি রাজতান্ত্রিক মহাজনপদ ছিল মগধ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগে মগধ ছিল দক্ষিণ বিহারের একটি সামান্য এলাকা। কিন্তু দক্ষ রাজাদের নেতৃত্বে মগধ আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে। সেকালে মগধ বলতে এখনকার বিহারের পাটনা ও গয়া জেলাকে বোঝাত। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। পরে পাটলিপুত্র রাজধানী হয়ে যায়।

মগধ রাজ্য নদী ও পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল। ফলে বাইরের আক্রমণ থেকে মগধ সহজেই বেঁচে যেতে পারত। গঙ্গা নদীর পলিমাটি ঐ অঞ্চলের কৃষিজমিকে উর্বর করে তুলেছিল। মগধ অঞ্চলের ঘন বনগুলিতে অনেক হাতি পাওয়া যেত। সেই হাতিগুলি মগধের রাজারা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতেন। পাশাপাশি সেখানে অনেকগুলি লোহা ও তামার খনি ছিল। ফলে মগধের রাজারা সহজেই লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন। জল ও স্থলপথে মগধের বাণিজ্য চলত। এসব সুবিধার ফলে মগধই শেষপর্যন্ত সবথেকে শক্তিশালী মহাজনপদে পরিণত হয়।

কয়েকটি মহাজনপদ ছিল অরাজতান্ত্রিক। সেখানে কোনো রাজার শাসন ছিল না। সেগুলিকে বলা হতো *গণরাজ্য*। এরকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ গণরাজ্য ছিল মল্ল ও বজ্জি বা বৃজি। সাধারণভাবে গণরাজ্যগুলিতে একেকটি উপজাতি বাস করত। তারা নিজের নিজের রাজ্যে অরাজতান্ত্রিক শাসন বজায় রেখেছিল।

মানচিত্র ৫.১ : ষোড়শ মহাজনপদ (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক)

গণরাজ্যগুলিতে জনগণ সবাই মিলে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কর্তব্য ঠিক করতেন। অবশ্য নারী ও দাসেরা ঐ আলোচনায় অংশ নিতে পারতেন না।

রাজতান্ত্রিক মহাজনপদগুলি গণরাজ্যগুলিকে দখল করতে চাইত। গণরাজ্যগুলির মধ্যে তিনটি রাজ্য স্বাধীন থেকে গিয়েছিল। বজ্জিদের রাজ্য ও মল্লদের দুটি রাজ্য— পাবা ও কুশিনারা। এদের মধ্যে বজ্জিদের শক্তি সবচেয়ে বেশি ছিল। বজ্জি মহাজনপদটি ছিল মগধের খুব কাছেই। বজ্জির শাসন ক্ষমতা ছিল কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে।

গৌতম বুদ্ধের সময় বজ্জিরা একজোট ও স্বাধীন ছিল। বুদ্ধ নিজেও বজ্জিদের সম্মান করতেন। বজ্জিদের রাজধানী ছিল বৈশালী। বৈশালীর আশেপাশে যেসব বজ্জি থাকত তাদের বলা হত লিচ্ছবি। গৌতমবুদ্ধ বজ্জিদের একজোট থাকার জন্য কয়েকটি নিয়ম পালনের কথা বলেছিলেন। সেই নিয়মগুলি দেখে মনে হয় বজ্জিদের রাজ্যে আইনকানুন অনেকটা লেখা থাকত। সেখানে নিরপরাধ মানুষের শাস্তি হতো না।

টুকরো কথা

মগধের রাজাদের সাল-তারিখ

মগধ মহাজনপদে মোট তিনটি রাজবংশ শাসন করেছিল। সেগুলি হলো হর্যঙ্ক, শৈশুনাগ এবং নন্দ রাজবংশ। তবে ঠিক কবে কে মগধের রাজা ছিলেন, তা বলা মুশকিল। একটা আনু-মানিক সাল-তারিখ অবশ্য তৈরি করা যায়। গৌতম বুদ্ধের মারা যাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে এই সালগুলো গোনা হয়েছে। মনে করা হয় রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বের আট বছরের মাথায় গৌতম বুদ্ধ মারা যান। সেই সালটি ধরা হয় ৪৮৬ খ্রি:পূ:। সেই হিসেবে মগধে হর্যঙ্ক বংশের শাসন শুরু হয়েছিল ৫৪৫ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে। আর নন্দ বংশের শাসন শেষ হয়েছিল ৩২৪ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে।

রাজতান্ত্রিক মহাজনপদগুলির সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে গণরাজ্যগুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের জন্য দরকার হতো অনেক সৈন্য। সৈন্যদের জন্য খরচ হতো অনেক। সেই খরচের অর্থ জোগাড় করা হতো প্রজাদের ওপর কর বসিয়ে। গণরাজ্যগুলিতে সেই বাড়তি কর আদায় করা সহজ ছিল না। পাশাপাশি সেগুলির মধ্যে গোষ্ঠীবিবাদ পাকিয়ে ওঠে। ফলে গণরাজ্যগুলির পক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা

বজ্জিদের উন্নতির সাতটি নিয়ম

মগধের রাজা অজাতশত্রু একবার বজ্জিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের মতামত জানতে তিনি একজন কর্মচারীকে বুদ্ধের কাছে পাঠান। বুদ্ধ তখন নিজের শিষ্য আনন্দর সঙ্গে সে বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। ঐ আলোচনায় বজ্জিদের দেওয়া বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে সাতটি নিয়মের কথা ওঠে। বুদ্ধ বলেন, সেই নিয়মগুলি মেনে চললে বজ্জিদের উন্নতি অটুট থাকবে। রাজা অজাতশত্রু কোনোভাবেই বজ্জিদের হারাতে পারবেন না। সেই নিয়মগুলি হলো—

ক) বজ্জিদের প্রায়ই সভা করে রাজ্য চালাতে হবে।
খ) বজ্জিদের সব কাজ সবাই মিলে একজোট হয়ে করতে হবে।
গ) বজ্জিদের নিজেদের বানানো আইন অনুসারে চলতে হবে।
ঘ) বজ্জিসমাজে বয়স্ক মানুষদের কথা শুনে চলতে হবে ও তাদের সম্মান করতে হবে।
ঙ) বজ্জিসমাজে নারীদের সবসময় সম্মান করে চলতে হবে।
চ) বজ্জিদের সমস্ত দেবতার মন্দিরগুলির যত্ন নিতে হবে।
ছ) নিজেদের অঞ্চলে গাছপালা ও পশুপাখিদের উপর অত্যাচার করা যাবে না।

???

ভেবে দেখো

গৌতম বুদ্ধ বজ্জিদের যে সব পরামর্শ দিয়েছিলেন তার মধ্যে কোনগুলো আজও মেনে চলা উচিত? তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

৫.২ নব্যধর্ম আন্দোলন

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বদলাতে শুরু করে। কৃষি হয়ে ওঠে বেশিরভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা। লোহার লাঙলের ব্যবহার বাড়ায় ফসলের উৎপাদন খুব বেড়ে যায়। পাশাপাশি নতুন নতুন নগর এই সময় গড়ে উঠছিল। সেগুলির বাসিন্দাদের একটা বড়ো অংশ ছিল ব্যবসায়ী ও কারিগর। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী ছিল।

যজ্ঞ, পশুবলি ও যুদ্ধের ফলে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নানা ক্ষতি হতো। চাষের কাজে গবাদিপশুর প্রয়োজন হতো। তাই যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া কৃষকদের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। পাশাপাশি বিভিন্ন জনপদ ও উপজাতিগুলির মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ব্যবসার ক্ষতি করেছিল। অথচ নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাও ব্যবসার জন্য জরুরি ছিল। ধর্মের নামে বেড়েছিল আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান। আগে সমাজে কাজের ভিত্তিতে শ্রেণিভাগ ছিল। কিন্তু পরে তা জন্মগত হয়। আর এভাবে প্রবল হয় জাতিভেদ। এই জাতিভেদ প্রথার জন্য সাধারণ মানুষ বৈদিক ধর্মের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাই সমাজে নতুন ধর্মমতের চাহিদা তৈরি হয়েছিল।

বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হতো। অথচ সমুদ্রযাত্রাকে পাপ হিসাবে দেখত ব্রাহ্মণেরা। ব্যবসা চালাতে গেলে পয়সার লেনদেন ও সুদে টাকা খাটানোর দরকার পড়ত। কিন্তু সুদ নেওয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নিন্দার বিষয় ছিল।

লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের সমান ক্ষমতা দাবি করতে থাকে। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বদলে নতুন সহজ সরল ধর্মের খোঁজ শুরু হয়েছিল। সেই চাহিদা পূরণ করেছিল বেশ কিছু ধর্ম, যার মধ্যে প্রধান দুটি হলো জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিল এইসব ধর্মগুলি। সহজ সরল জীবনযাপনের ওপরে তারা জোর দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও বেদের বিরোধিতা করে ধর্ম সম্পর্কে অনেক নতুন কথা বলেছিলেন এইসব ধর্মের প্রচারকরা। নতুন এই ধর্মমতগুলিকেই *নব্যধর্ম* (নতুন ধর্ম) বলা হয়।

জৈন ধর্ম

নতুন তৈরি হওয়া ধর্মমতগুলির মধ্যে জৈন ধর্ম ছিল অন্যতম প্রধান। এই ধর্মের প্রধান প্রচারককে বলা হতো *তীর্থঙ্কর* । জৈন ধর্ম অনুযায়ী মোট চব্বিশজন তীর্থঙ্কর ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শেষ দুজন হলেন পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান মহাবীর। পার্শ্বনাথ ছিলেন কাশীর রাজপুত্র। তিনি ছিলেন মহাবীরের প্রায় আড়াইশো বছর আগের মানুষ।

বর্ধমান মহাবীর (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০-৪৬৮) লিচ্ছবি বংশের ক্ষত্রিয় রাজকুমার ছিলেন। বজ্জি জনপদের সঙ্গো লিচ্ছবিদের যোগাযোগ ছিল। তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে তপস্যা করতে চলে যান। টানা বারো বছর অনেক কষ্ট মেনেও তপস্যা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত তিনি সর্বজ্ঞানী হন ও কেবলিন নামে পরিচিত

টুকরো কথা
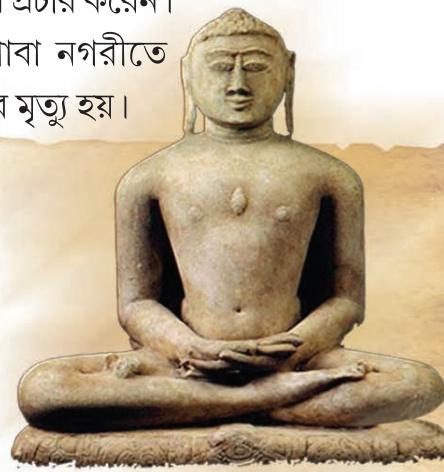
চার্বাক ও আজীবিক

জৈন ও বৌদ্ধদের আগেও ব্রাহ্মণদের ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন চার্বাক ও আজীবিক গোষ্ঠী। এঁরা কেউই বেদকে চূড়ান্ত বলে মানতেন না। চার্বাকরা বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা স্বর্গের ধারণা মানতেন না। যজ্ঞে পশুবলির বিরোধী ছিলেন চার্বাকরা। আজীবিক গোষ্ঠী তৈরি করেন মংখলিপুত্ত গোসাল। জানা যায় তিনি ছিলেন মহাবীরের বন্ধু। আজীবিকরা বেদ ও কোনো দেবতায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মানতেন না যে, মানুষ ভালো কাজ করলেই ভালো ফল পাবে। আজীবিকদের কোনো ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তাঁরা মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার ও অশোকের থেকেও সহায়তা পেয়েছিলেন।

ছবি. ৫.১:
বর্ধমান মহাবীর

হন। দীর্ঘ তিরিশ বছর মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচার করেন। আনুমানিক বাহাত্তর বছর বয়সে পাবা নগরীতে অনশন করেন মহাবীর। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

টুকরো কথা

চতুর্যাম ও পঞ্চমহাব্রত

জৈন ধর্মে চারটি মূলনীতি অবশ্যই মেনে চলতে হতো। সেগুলি হলো— ক) কোনো প্রাণী হত্যা না করা। খ) মিথ্যাকথা না বলা। গ) অন্যের জিনিস ছিনিয়ে না নেওয়া। ঘ) নিজের জন্য কোনো সম্পত্তি না করা। পার্শ্বনাথ এই চারটি মূল নীতি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নীতি চারটিকেই একসঙ্গে *চতুর্যামব্রত* বলা হয়। মহাবীর এই চারটি নীতির সঙ্গে আরো একটি নীতি যোগ করেন। তাঁর মতে, ব্রহ্মচর্য নীতিও জৈনদের মেনে চলা উচিত। এই পাঁচটি নীতিকে একসঙ্গে *পঞ্চমহাব্রত* বলা হয়।

গোড়ার দিকে জৈন ধর্ম মগধ, বিদেহ, কোশল ও অঙ্গারাজ্যের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। মৌর্যযুগে জৈনদের প্রভাব বাড়তে থাকে। জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে জৈন হয়ে যান। পরে ওড়িশা থেকে মথুরা পর্যন্ত জৈন ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। জৈন ধর্মের মূল উপদেশগুলি বারোটি ভাগে সাজানো হয়েছিল। এই ভাগগুলিকে *অঙ্গ* বলা হয়। সংখ্যায় বারোটি বলে অঙ্গাগুলিকে একসঙ্গো বলা হয় *দ্বাদশ অঙ্গ*।

টুকরো কথা

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনের শেষ দিকে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সেইসময় অনেক জৈন সন্ন্যাসী উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। ঐ চলে যাওয়া থেকেই জৈনদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায়। দাক্ষিণাত্যে চলে যাওয়া জৈন সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন ভদ্রবাহু। তিনি বর্ধমান মহাবীরের পথকেই কঠোরভাবে মেনে চলতেন। মহাবীরের মতোই ভদ্রবাহু ও তার অনুগামীরা কোনো পোশাক পরতেন না। এর জন্যেই তাঁদের **দিগম্বর** বলা হয়।

অন্যদিকে উত্তর ভারতে থেকে যাওয়া জৈনদের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র। তিনি পার্শ্বনাথের মতো জৈনদের একটা সাদা কাপড় ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জৈন সন্ন্যাসীদের গোষ্ঠী **শ্বেতাম্বর** বলে পরিচিত হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতক নাগাদ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের বিভেদ পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিশেষ তফাত ছিল না।

বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধের প্রথম নাম ছিল সিদ্ধার্থ। নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুর শাক্য বংশে সিদ্ধার্থের জন্ম হয় (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দ)। সিদ্ধার্থও মহাবীরের মতোই ক্ষত্রিয় বংশের মানুষ ছিলেন। ঊনত্রিশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থ সংসার ছেড়ে তপস্যা করতে চলে যান। প্রায় ছ-বছর তপস্যা করার পর সিদ্ধার্থ *বোধি* বা জ্ঞান লাভ করেন। বোধি লাভ করার জন্যই তার নাম হয় *বুদ্ধ*। তাই বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্ম।

টুকরো কথা

গৌতম বুদ্ধের প্রথম উপদেশ

সিদ্ধার্থ গয়ার কাছাকাছি একটি পিপল গাছের নীচে বসে তপস্যা করেছিলেন। সেখানেই তাঁর বোধি বা জ্ঞান লাভ হয় বলে ঐ গাছটিকে **বোধিবৃক্ষ** বলা হয়। গয়া থেকে গৌতম বুদ্ধ বারাণসীর কাছে সারনাথে যান। সেখানে পাঁচজন সঙ্গীর মধ্যে তাঁর উপদেশ প্রথম প্রচার করেন। এই পাঁচজনই তাঁর প্রথম পাঁচ শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে তিনি মানুষের জীবনে দুঃখের কারণগুলি ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী সময়ে ঐ ঘটনাকে **ধর্মচক্র প্রবর্তন** বলা হয়েছে।

ছবি. ৫.২:
ধ্যানে বসা গৌতম বুদ্ধের একটি মূর্তি

বুদ্ধ নিজের শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন দুঃখের কারণ কী? কীভাবে সেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? এই প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যায় বুদ্ধ চারটি মূল উপদেশ দেন। প্রতিটি উপদেশকে বলা হয় *আর্যসত্য*। ঐ চারটি উপদেশকে একসঙ্গে *চতুরার্যসত্য* বলা হয়। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আটটি উপায়ের কথা গৌতম বলেছিলেন। সেই আটটি উপায়কে একসঙ্গে বলা হয় *অষ্টাঙ্গিক মার্গ*। *মার্গ* মানে পথ। আটটি পথকে তাই একসঙ্গে *অষ্টাঙ্গিক মার্গ* বলা হয়।

এরপর বুদ্ধ রাজগৃহে যান। সেখানে মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্য হন। বছরে আট মাস ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁর মতামত প্রচার করতেন। কোশল রাজ্যে গৌতম বুদ্ধ টানা ২১ বছর ছিলেন। প্রায় ৪৫ বছর ধর্মপ্রচারের পর কুশিনগরে গৌতম বুদ্ধ মারা যান (আনুমানিক ৪৮৬ খ্রি:পূ:)।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে *বৌদ্ধ ধর্মসংগীতি*গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধর্মসংগীতি অনেকটা ধর্মসম্মেলনের মতো। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সমবেত হতেন। বৌদ্ধ ধর্মের নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। সংগীতিগুলিতে নানা বিবাদের প্রসঙ্গও উঠত। এমন চারটি সংগীতির কথা জানা যায়। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পরে পরেই প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি হয়েছিল।

তালিকা ৫.১: একনজরে প্রথম চারটি বৌদ্ধ সংগীতি

সংগীতি	স্থান	শাসনকাল	সভাপতি	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
প্রথম	রাজগৃহ	অজাতশত্রু	মহাকাশ্যপ	সুত্ত ও বিনয় পিটক সংকলন করা হয়
দ্বিতীয়	বৈশালী	কালাশোক বা কাকবর্ণ	যশ	বৌদ্ধরা থেরবাদী ও মহাসাংঘিক— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান
তৃতীয়	পাটলিপুত্র	অশোক	মোগগলিপুত্ত তিসস	বৌদ্ধ সংঘের নিয়মগুলি কঠোরভাবে মানার উপরে জোর পড়ে। সংঘের মধ্যে ভাঙন আটকাবার চেষ্টা হয়
চতুর্থ	কাশ্মীর	কনিষ্ক	বসুমিত্র	বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়

ছবি. ৫.৩: গৌতম বুদ্ধের মারা যাওয়ার দৃশ্যের একটি ভাস্কর্য

টুকরো কথা

হীনযান ও মহাযান

জীবনযাপন ও ধর্মীয় আচরণ বিষয়ে বৌদ্ধ সংঘে মতবিরোধ তৈরি হয়। বেশ কিছু সন্ন্যাসী আমিষ খাবার খেতে থাকেন। দামি, ভালো পোশাক পরতে থাকেন। সোনা-রুপো দান হিসাবে নিতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে কিছু সন্ন্যাসী প্রায় পারিবারিক জীবনযাপন শুরু করেন। সংঘের নিয়মনীতি শিথিল হতে থাকে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মে **মহাযান** নামে এক নতুন দল তৈরি হয়। কুষাণ আমল থেকে বুদ্ধের মূর্তি পুজোর চল শুরু হয়। মহাযানীরা মূর্তি পুজোর সমর্থক ছিলেন। এর ফলে পুরোনো মতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মহাযান মতামতের বিরোধী হয়ে পড়েন। তাঁরা **হীনযান** নামে পরিচিত হন। সম্রাট কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধমতের সমর্থক ছিলেন। চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতেই হীনযান ও মহাযানরা চূড়ান্তভাবে আলাদা হয়ে যায়।

টুকরো কথা

তিপিটক বা ত্রিপিটক

বৌদ্ধ ধর্মে **তিপিটক** (ত্রিপিটক) প্রধান গ্রন্থ। সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক— এই তিনটি ভাগ নিয়ে তিপিটক। **পিটক** কথার মানে হলো ঝুড়ি। তিনটি সংকলনকে তিনটি ঝুড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুত্তপিটক হলো গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের উপদেশগুলির সংকলন। বিনয়পিটকে বৌদ্ধসংঘেরও বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের আচার-আচরণের নিয়মগুলি আছে। অভিধম্মপিটক গৌতম বুদ্ধের মূল কয়েকটি উপদেশের আলোচনা। এগুলি সবই পালি ভাষায় লেখা।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর রাজগৃহে বৌদ্ধদের প্রথম সভা হয়েছিল। জানা যায় যে, সেখানে ত্রিপিটকের সংকলনগুলি তৈরি হয়। গল্প আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তখন সুভদ্র নামের একজন শিষ্য বলেন, এবারে আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে পারব। সবসময় বুদ্ধের কথা মতো চলতে হবে না। বুদ্ধের আরেক শিষ্য ছিলেন মহাকাশ্যপ। তিনি সুভদ্রের কথা শুনে ভাবলেন, এখনই বৌদ্ধ ধর্মের নিয়মগুলি সংকলন করতে হবে। নয়তো সবাই নিজেদের ইচ্ছামতো চলবে। তাতে বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হবে। সেইমতো মহাকাশ্যপ রাজগৃহে সভা ডাকলেন। সেইসভায় প্রথম দুটি পিটক সংকলন করা হলো।

বর্ধমান মহাবীরের সঙ্গো গৌতম বুদ্ধের কয়েকটি মিল ছিল। তাঁরা দুজনেই ক্ষত্রিয় পরিবারের মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতাও করেছিলেন তাঁরা দুজনেই। সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সবার বোঝার সুবিধের জন্য ব্যবহার করেছিলেন সহজ সরল ভাষা। প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য উন্নত হয়েছিল জৈন ধর্মের হাত ধরে। বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের ভাষা ছিল পালি।

তবে মহাবীর কঠোর তপস্যার উপরে জোর দিয়েছিলেন। অন্যদিকে গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন কঠোর তপস্যা *নির্বাণ* বা মুক্তি লাভের উপায় নয়। আবার চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসেও মুক্তির খোঁজ পাওয়া যায় না। বুদ্ধ তাই *মজঝিম পতিপদা* বা মধ্যপন্থার কথা বলেছিলেন।

মহাবীর ও বুদ্ধ দুজনেই ধর্ম প্রচারের জন্য নগরগুলিতে বেশি যেতেন। নগরে নানারকমের মানুষকে একসঙ্গো পাওয়া যায়। তুলনায় গ্রামে জনগণের বেশিরভাগই ছিল কৃষক। আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নগরে যাওয়া বা থাকা *পাপ* বলে ধরা হতো। তাই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সেইসময়ের নগরগুলোতেই বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। একথা অবশ্য নব্যধর্ম আন্দোলন বিষয়েই খাটে। মূলত ঐ আন্দোলন ছিল নগরকেন্দ্রিক।

টুকরো কথা

ত্রিরত্ন

জৈন ও বৌদ্ধ— দুই ধর্মেই **ত্রিরত্ন** বলে একটি ধারণা আছে। তিনটি বিষয়কে দুটি ধর্মেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সেগুলির একেকটিকে **রত্ন** বলে। সংখ্যায় তিনটি তাই তা একসঙ্গো ত্রিরত্ন। তবে জৈন ধর্মের ত্রিরত্ন বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন থেকে আলাদা।

সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান ও সৎ আচরণের উপরে জৈনরা জোর দিতেন। এই তিনটিকে একসঙ্গো জৈন ধর্মে ত্রিরত্ন বলা হতো। বৌদ্ধধর্মে গৌতমবুদ্ধ প্রধান ব্যক্তি। তাঁর প্রচার করা ধর্মই বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দায়িত্ব বৌদ্ধ সংঘের। এই তিন মিলে হয় **বুদ্ধ-ধম্ম-সংঘ**। এই তিনটি বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন।

জাতকের গল্প

তিপিটকের মধ্যে *জাতক* নামে কিছু গল্প রয়েছে। মনে করা হয় গৌতম বুদ্ধ আগেও নানান সময়ে জন্মেছিলেন। সেই আগের এক একটি জন্মের কথা জাতকের এক একটি গল্পে বলা হয়েছে। প্রতিটি গল্পের মধ্যে কিছু না কিছু উপদেশ রয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্যই জাতকের গল্পগুলি ব্যবহার করা হতো। পাঁচশোরও বেশি জাতকের গল্প রয়েছে। গল্পগুলি পালি ভাষায় বলা ও লেখা হতো। মানুষের পাশাপাশি পশুপাখিরাও জাতকের গল্পে চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে। জাতকের গল্পগুলি থেকে সেইসময়ের সমাজ বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।

সেরিবান ও সেরিবা (সেরিবাণিজ-জাতক)

অনেক দিন আগে সেরিব নামে একটা রাজ্য ছিল। সেখানে থাকত সেরিবান ও সেরিবা নামে দুজন ফেরিওলা। তারা পুরোনো জিনিস কিনত, আর নতুন জিনিস বেচত। সেরিবা সবাইকে ঠকাত। বেশি দামে জিনিস বিক্রি করত। কিন্তু সেরিবান কাউকে ঠকাত না। উচিত দামেই সে জিনিস বিক্রি করত।

একদিন সেরিবা একটা বাড়ির সামনে গিয়ে *খেলনা নেবে* বলে হাঁক দিল। সে বাড়িতে একটা ছোটো মেয়ে তার ঠাকুমার সঙ্গে থাকত। তারা খুবই গরিব। ছোটো মেয়েটা খেলনার জন্য ঠাকুমার কাছে বায়না ধরল। ঠাকুমা তখন একটা ভাঙা থালা নিয়ে খেলনা কিনতে এল। সেরিবাকে বলল, এই থালাটার যা দাম হয় দাও। নাতনির জন্য একটা খেলনা নেব। সেরিবা ভালো করে দেখল থালাটা সোনার। সে ফন্দি করে বলল, থালাটা ভাঙা, কানাকড়িও এটার দাম নয়। এমনি দিলে তাও নিতে পারি। ঠাকুমা বলল, তাহলে থাক। সেরিবা ভাবল একটু ঘুরে আবার একবার এখানে আসতে হবে। এমনিতে না দিলেও, দুটো পয়সা দিলে নিশ্চয়ই থালাটা দিয়ে দেবে। কোনোভাবেই এটা হাতছাড়া করা যাবে না।

খানিক পরেই সেরিবান সেই বাড়িতেই গেল। ছোটো মেয়েটি আবার খেলনার জন্য ঠাকুমার কাছে বায়না ধরল। ঠাকুমা আবার সেই ভাঙা থালাটি সেরিবানকে দেখতে দিল। থালাটা দেখে সেরিবান বলল, এ তো সোনার থালা! অনেক দাম! আমার এই থালা কেনার মতো ক্ষমতা নেই। তখন ঠাকুমা সেরিবানকে বলল, তুমি যা দিতে পারবে তাই দাও। বেশি চাই না। তুমি বলার আগে জানতাম না এটা সোনার থালা। তাই এটা তুমিই নাও। সেরিবান তখন তার সব মুদ্রা ঠাকুমার হাতে দিল। আর তার নাতনিকে দিল কয়েকটা সুন্দর খেলনা। ঠাকুমা ও নাতনি তাতেই খুশি। থালাটি নিয়ে সেরিবান চলে গেল।

এদিকে সেরিবা খানিক পরেই আবার ফিরে এল ঐ বাড়িতে। এসে সব শুনে সে বুঝল থালাটা সেরিবানই নিয়ে গেছে। সেরিবা ছুটল সেরিবানকে ধরবে বলে। যদি থালাটা পাওয়া যায়। কিন্তু সেরিবানকে সে খুঁজেই পেল না। সোনার থালাটা সেরিবার আর পাওয়া হলো না।

↑ ছবি. ৫.৪.
সামেত-শিখর, জৈনদের পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র। মনে করা হয় ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জন এই শিখরেই নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

← ছবি. ৫.৫.
বুদ্ধপদ (গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ), পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য, অমরাবতী। পায়ের ছাপের মাঝে ধর্মচক্র রয়েছে।

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। **সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

১.১) মহাজনপদগুলি গড়ে উঠেছিল ———— (খ্রি: ষষ্ঠ শতকে/খ্রি: পূ: ষষ্ঠ শতকে/খ্রি: ষষ্ঠ সহস্রাব্দে)।

১.২) গৌতম বুদ্ধ জন্মেছিলেন ———— (লিচ্ছবি/ হর্যঙ্ক/শাক্য) বংশে।

১.৩) পার্শ্বনাথ ছিলেন ———— (মগধের রাজা/বজ্জিদের প্রধান/জৈন তীর্থংকর)।

১.৪) আর্যসত্য ———— (বৌদ্ধ/জৈন/আজীবিক) ধর্মের অংশ।

২। **ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
মগধের রাজধানী	বৌদ্ধ ধর্ম
মহাকাশ্যপ	রাজগৃহ
দ্বাদশ অঙ্গ	প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি
হীনযান-মহাযান	জৈন ধর্ম

৩। **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :**

৩.১) মগধ ও বৃজি মহাজনপদদুটির মধ্যে কী কী পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে?

৩.২) কী কী কারণে মগধ শেষ পর্যন্ত বাকি মহাজনপদগুলির থেকে শক্তিশালী হলো ? সেই কারণগুলির মধ্যে কোনটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৩.৩) সমাজের কোন কোন অংশের মানুষ নব্যধর্ম আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন? কেন করেছিলেন?

৩.৪) জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মে কী কী মিল ও অমিল তোমার চোখে পড়ে?

৪। **হাতেকলমে করো :**

৪.১) জনপদ থেকে ষোলোটি মহাজনপদ এবং তার থেকে মগধ রাজ্য কীভাবে হলো, তা পিরামিডের আকারে দেখাও।

৪.২) ৬৪ ও ৬৫ নম্বর পৃষ্ঠা জোড়া ছবিটি দেখো। বৌদ্ধ ধর্মে আর্যসত্যের ধারণার সঙ্গে ঐ ছবিটির কি কোনো মিল দেখতে পাচ্ছো?

৬
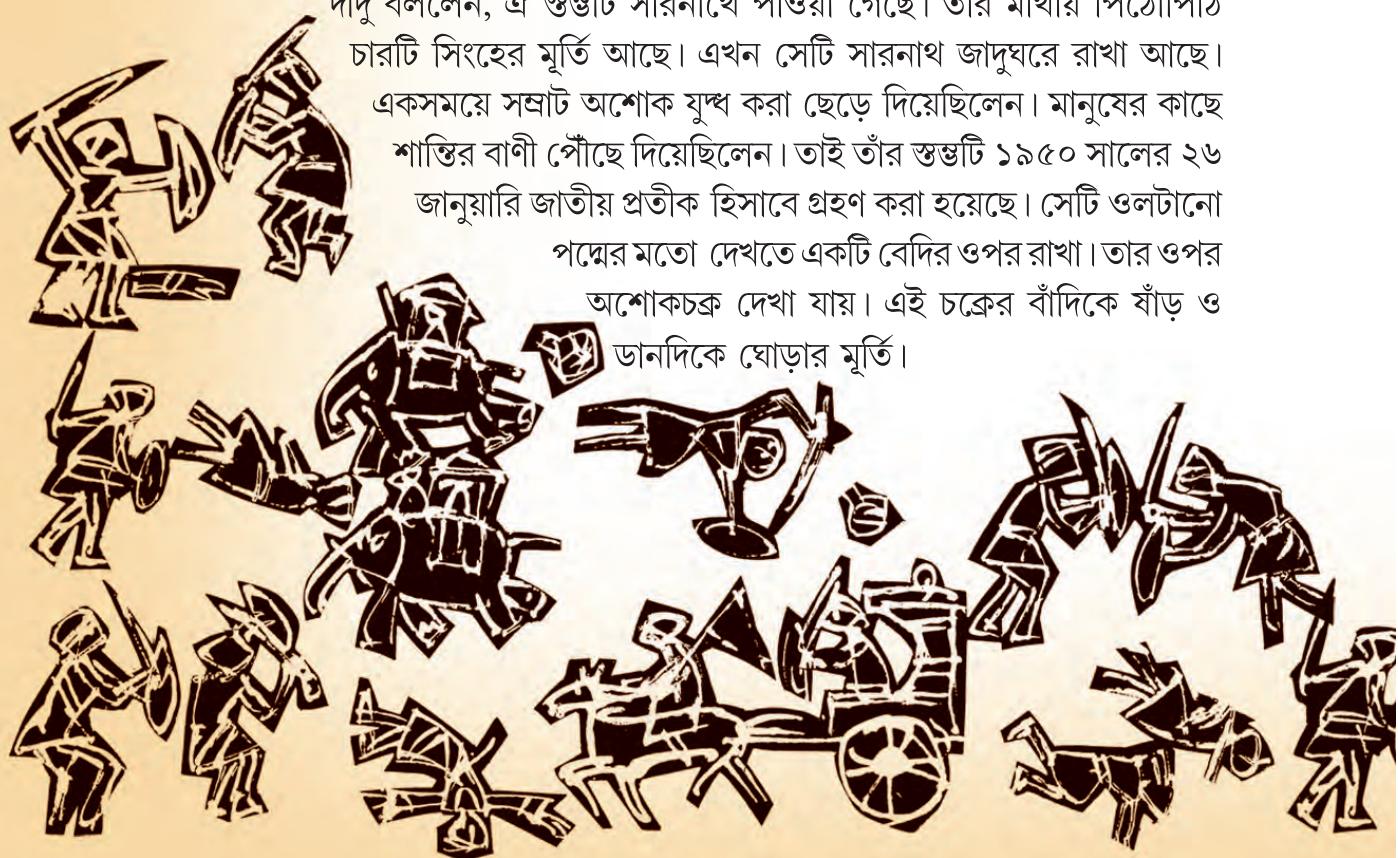
সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ

সামিমের কাছে পুরোনো দিনের অনেকগুলো পয়সা আছে। ওর নানা ওকে দিয়েছিলেন। ১ পয়সা, ৫ পয়সা, ১০ পয়সা। কোনোটা চৌকো, কোনোটা ফুলের মতো। স্টিলের চকচকে ছোটো গোল দশ পয়সাগুলো সামিমের খুব প্রিয়। পুরোনো কয়েকটা ২ টাকার নোটও আছে ওর। একদিন সবগুলোই বন্ধুদের আর রুবির দাদুকে দেখাতে নিয়ে গেল। দাদু সব দেখে বললেন, দারুণ তো। তোমরা আর কেউ কিছু জমাও নাকি? পলাশ বলল, আমি খেলনা জমাই। ছোটোবেলার সব খেলনা রয়েছে আমার। রাবেয়া বলল, আমিও খেলনা জমাই। দাদু বললেন, পুরোনো দিনের নানান জিনিস জমিয়ে রাখা ভালো। তাতে একসময়ে বোঝা যাবে সেই জিনিসগুলো কেমন ছিল পুরোনো দিনে। তারপর বললেন, এই যে টাকায় বা পয়সায় সিংহের মুখওলা একটা ছাপ থাকে সেটা কী বলোতো? সবাই বলল, অশোকস্তম্ভ। দাদু বললেন, কেন ঐ স্তম্ভটা টাকা-পয়সায় ছাপা থাকে জানো? রাবেয়া বলল, সম্রাট অশোকের ঐ স্তম্ভটাই ভারতের জাতীয় প্রতীক।

দাদু বললেন, ঐ স্তম্ভটি সারনাথে পাওয়া গেছে। তার মাথায় পিঠোপিঠি চারটি সিংহের মূর্তি আছে। এখন সেটি সারনাথ জাদুঘরে রাখা আছে। একসময়ে সম্রাট অশোক যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। মানুষের কাছে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর স্তম্ভটি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সেটি ওলটানো পদ্মের মতো দেখতে একটি বেদির ওপর রাখা। তার ওপর অশোকচক্র দেখা যায়। এই চক্রের বাঁদিকে ষাঁড় ও ডানদিকে ঘোড়ার মূর্তি।

সেদিন বাড়ি ফিরে পৃথার মনে খটকা লাগল। দাদু অশোককে রাজা না বলে সম্রাট বললেন কেন? তাহলে কী রাজা আর সম্রাট আলাদা? পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে সেই প্রশ্নই করল পৃথা। দিদিমণি বললেন, হ্যাঁ, রাজা আর সম্রাট আলাদা। এবারে তাহলে তোমাদের সম্রাট আর সাম্রাজ্যের কথা বলা যাক।

৬.১ সাম্রাজ্য কী ? সম্রাট কে?

সহজ করে বললে, *সাম্রাজ্য* একটা বিরাট অঞ্চলকে বোঝায়। ধরা যাক, একটা রাজ্যে কয়েক হাজার জনগণ থাকে। তাহলে একটা সাম্রাজ্যে কয়েক লক্ষ জনগণ থাকবে। অনেকগুলো রাজ্য জুড়ে একটা বড়ো শাসন এলাকা হয়। সেই বড়ো শাসন এলাকাটাই সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্য শাসন করেন যিনি, তিনিই *সম্রাট*। সম্রাট মানে বড়ো রাজা। যে রাজা অনেক জনগণ ও অঞ্চলের শাসক তিনিই সম্রাট। তাঁর শাসন এলাকায় তাঁর কথাই শেষ কথা। তিনি রাজাদেরও রাজা। অর্থাৎ *রাজাধিরাজ* (রাজা+অধিরাজ)। তবে সম্রাট যদি মহিলা হন, তখন তাকে বলা হয় *সম্রাজ্ঞী*।

সাম্রাজ্য তৈরি হয় যুদ্ধ করে। ধরা যাক, একজন রাজা যুদ্ধ করে অন্য রাজাদের হারিয়ে দিল। তারপর সব রাজ্যগুলো এক করে একটা বড়ো শাসন এলাকা তৈরি হলো। তাকেই সাম্রাজ্য বলা হয়। সেই জয়ী রাজা একটা বড়ো যজ্ঞ করে বিরাট উপাধি নিলেন। তখন তাঁর চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কেউ থাকল না। তিনি হয়ে গেলেন সম্রাট। সবক্ষেত্রে যদিও রাজা যজ্ঞ করে সম্রাট হতেন না।

৬.২ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি হলো কীভাবে?

ষোলটি মহাজনপদের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। এই এক একটা মহাজনপদ ছিল এক একটা রাজ্য। মগধ মহাজনপদে পরপর তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। সেইসব রাজারা অন্যান্য মহাজনপদের বেশিরভাগকে নিজেদের দখলে আনেন। শেষপর্যন্ত মগধকে ঘিরেই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি হয়। তার নাম মৌর্য সাম্রাজ্য।

টুকরো কথা

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ নাগাদ হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছেছিলেন গ্রিসের ম্যাসিডনের শাসক আলেকজান্ডার। উপমহাদেশের বিভিন্ন ছোটো-বড়ো শাসকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। এর মধ্যে এলডার পোরোস বা রাজা পুরুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ খুব বিখ্যাত। পুরুর রাজত্ব ছিল ঝিলাম ও চেনাব নদী দুটির মাঝের অঞ্চলে। বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে পুরু আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু গ্রিকবাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত পুরু হেরে যান। তবু তাঁর বীরত্বকে গ্রিকরা সম্মান জানিয়েছিল।

প্রায় তিন বছর আলেকজান্ডার উপমহাদেশে ছিলেন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দ-এ তিনি বাহিনী সমেত ফিরে যান। পশ্চিম এশিয়া হয়ে গ্রিসে ফেরার পথে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে পাঞ্জাব পর্যন্ত আলেকজান্ডার এগিয়েছিলেন। গঙ্গা উপত্যকার দিকে তিনি এগোননি। তবে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে উপমহাদেশের উত্তরে ছোটো ছোটো শক্তিগুলির ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। তার ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দ নাগাদ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সহজ হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেক সহজেই মৌর্যদের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছবি. ৬.১: আলেকজান্ডার ও তাঁর প্রিয় ঘোড়া বুকেফেলাস

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কথা

উপমহাদেশে আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় মগধের সিংহাসনে ছিলেন নন্দ রাজারা। এঁরা যদিও প্রজাদের প্রিয় ছিলেন না। চাণক্য নামের এক পণ্ডিত নন্দরাজাদের রোষের মুখে পড়েন। চাণক্যের সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দরাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। শেষ নন্দরাজা ধননন্দ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে হেরে যান। এইভাবে মগধে মৌর্যদের শাসন শুরু হয়। নন্দদের সময়ে উত্তর ভারতে মগধের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই ক্ষমতাকে আরও অনেক বাড়িয়ে তোলেন। আলেকজান্ডারের সহকারী গ্রিক প্রশাসকদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যুদ্ধ করেন। সিন্ধু উপত্যকার দখল নিয়ে গ্রিকদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সংঘাত বাধে। ঐ অঞ্চলের শাসক ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি

সেলিউকাস নিকেটর। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাদ একটি চুক্তির মাধ্যমে মিটে যায়। দুই পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। দুজনেই একে অন্যকে নানান উপহার ও সুযোগ-সুবিধা দেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যই প্রথম সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫/৩২৪-৩০০ অব্দ)। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই।

টুকরো কথা

অর্থশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতের শাসন পরিচালনার বিষয়ে বেশ কিছু বই লেখা হয়। রাজ্যশাসন কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা থাকত ঐ বইগুলিতে। তেমনই একটি বই **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র**। এর লেখক **কৌটিল্য**। অনেকে কৌটিল্য ও চাণক্যকে একই ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু একথা এখন প্রমাণিত যে, কৌটিল্য ও চাণক্য আলাদা ব্যক্তি।

ঠিক কবে অর্থশাস্ত্র লেখা হয়, তা বলা মুশকিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ এই বইয়ের কিছু অংশ লেখা হয়েছিল। তবে খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক নাগাদ অর্থশাস্ত্র লেখার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেই চেহারায় আজকে বইটি দেখা যায়। তাই একা কৌটিল্য এই বইটি বোধহয় লেখেননি। তবে এর মূল বিষয়গুলো তাঁর লেখা বলেই তাঁর নামে বইটি পরিচিত। বইয়ের নামটি থেকে মনে হতে পারে যে, বইটি বোধহয় শুধু টাকাকড়ি নিয়ে লেখা। আসলে কিন্তু তা নয়। অর্থশাস্ত্রের মতে, রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে প্রধান হলেন রাজা। তাঁর কথাই শেষ কথা। এমনকি দরকারে রাজাকে ছল-চাতুরিও করতে হতে পারে। রাজকাজের সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা রয়েছে অর্থশাস্ত্রে। বইটিতে শাসকের কী কী করা উচিত তাই বলা হয়েছে। যদিও তার সব উপদেশই যে মৌর্য শাসকেরা মানতেন তেমন প্রমাণ নেই। মৌর্য আমলের ইতিহাস জানার জরুরি উপাদান অর্থশাস্ত্র।

???

ভেবে দেখো

অর্থশাস্ত্র বইটি একজন ব্যক্তির লেখা নয়। তেমনি তোমাদের জানা আর কোন কোন বইয়ের লেখক একজন নন? এইরকমভাবে অনেকে মিলে একটা বই লেখা হতো কেন বলে তোমার মনে হয়? প্রয়োজনে পৃষ্ঠা ১১৪-র টুকরো কথাটিও আলোচনার মধ্যে আনো।

মৌর্য সম্রাট অশোক

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর পরে তাঁর ছেলে বিন্দুসার সম্রাট হন (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ২৭৩ অব্দ)। বিন্দুসারের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য বিশেষ বাড়েনি। বিন্দুসারের ছেলে অশোক প্রায় চার দশক শাসন করেন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ)। গোড়ার দিকে নাকি অশোক খুব নিষ্ঠুর ছিলেন বলে জানা যায়।

সারা জীবনে মাত্র একটি যুদ্ধ করেন তিনি, কলিঙ্গ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যায়। সেই হিংসার জন্য পরে অশোক দুঃখ পান। জানা যায় যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্ত অশোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। এই ঘটনা কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে পরেই ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিংসা বন্ধ করেন অশোক। যুদ্ধ করাও ছেড়ে দেন তিনি। পশুদের মারাও বন্ধ করে দেন। সব মানুষ যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করেন। তবে তার পাশাপাশি সাম্রাজ্যটাও ধরে রাখেন সম্রাট অশোক। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। পশ্চিমে কাথিয়াওয়াড় থেকে পূর্বে কলিঙ্গও এই সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। অশোকের আমলেও মৌর্যদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

ছবি. ৬.২: সম্রাট অশোকের একটি ভাস্কর্য মূর্তি

ছবি. ৬.৩: মৌর্য আমলের মুদ্রা। মুদ্রার আকারটি খেয়াল করো

সাম্রাজ্য চালানোর নানা দিক

কলিঙ্গ রাজ্য জয় করার ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের এলাকা আরো বাড়ল। এতবড়ো সাম্রাজ্য এর আগে দেখা যায়নি। তবে শুধু সাম্রাজ্য বাড়লেই সম্রাটদের কাজ শেষ হয় না। ভালোভাবে শাসন কাজ চালানোর বিষয়টাও জরুরি। মৌর্য সম্রাটরা শাসন চালানোর বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে সম্রাটের হাতেই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা। বিচারব্যবস্থারও মাথায় ছিলেন সম্রাট নিজে। সম্রাটের জারি করা আদেশ প্রজারা মানতে বাধ্য থাকত। তবে মৌর্য প্রশাসনে পুরোহিতদের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় না। মৌর্য সম্রাটরা কোনো যজ্ঞ করে নিজেদের ক্ষমতা দাবি করেননি। তাঁরা *দেবানংপিয়* বা দেবতাদের প্রিয় উপাধি ব্যবহার করতেন। অশোক তার সঙ্গে *পিয়দসি* বা প্রিয়দর্শী উপাধিও যোগ করেছিলেন। ফলে মৌর্য সম্রাটরা প্রজার কাছে দেবতার মতোই সম্মাননীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতেন।

বিরাট মৌর্য সাম্রাজ্যের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল মগধ। অশোক নিজেকে *মগধরাজ* (*রাজা মাগধে*) বলে ঘোষণা করেছেন। উত্তর ভারতের অনেকগুলি রাজ্য মৌর্যরা জয় করেছিল। সেগুলো ছিল প্রধান প্রধান শাসন এলাকা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও দাক্ষিণাত্যের এলাকাগুলো ছিল *প্রান্তীয় অঞ্চল*। তবে মগধ ও প্রধান শাসন এলাকাগুলোতেই মৌর্য শাসনের দাপট সবথেকে বেশি ছিল।

সম্রাটের পরেই ছিলেন রাজকর্মচারীরা। তাদের বলা হতো *অমাত্য*। অমাত্যদের সাহায্যেই সম্রাট শাসন চালাতেন। মৌর্যদের সময়ে মন্ত্রী পরিষদ ছিল। তবে তাদের পরামর্শ মানতে সম্রাট বাধ্য ছিলেন না। অমাত্যদের মধ্যে তিনরকম পদের ভাগ ছিল। তাদের বেতনে পার্থক্য ছিল। সম্রাট অশোকের

সময়ে অবশ্য অমাত্যদের কথা জানা যায় না। তার বদলে *মহামাত্র*রা সবথেকে উঁচু পদগুলি পেতেন। সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থা অনেকটাই মহামাত্রদের ওপর নির্ভর করত। মহামাত্রদের মধ্যেও পদের নানা ভাগ ছিল। তাদের কাজের এলাকা আলাদা ছিল। মেয়েদেরও মহামাত্র হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হতো।

টুকরো কথা

পাটলিপুত্র নগর পরিচালনা : মেগাস্থিনিসের চোখে

গ্রিক শাসক সেলিউকাসের দূত হয়ে মেগাস্থিনিস কান্দাহার থেকে পাটলিপুত্রের রাজদরবারে যান। নিজের বই **ইন্ডিকা**তে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনের কথা লিখেছিলেন মেগাস্থিনিস। যদিও ঐ বইটি এখন পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য গ্রিক লেখকদের লেখায় বইটির নানা অংশ রয়েছে। গ্রিক হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষা ও সমাজ পুরোপুরি বুঝতে পারেননি মেগাস্থিনিস। ফলে তাঁর লেখায় অনেক ভুল আছে। তবু মৌর্য আমলের ইতিহাস জানার জন্য **ইন্ডিকা** জরুরি বিদেশি উপাদান।

মেগাস্থিনিসের লেখা থেকে পাটলিপুত্র নগরের শাসন পরিচালনার কথা জানা যায়। নগর পরিচালকদের ছয়টি দল ছিল। প্রতিটি দলে ছিল পাঁচজন করে লোক। ছ-টি দল মিলেই নগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দেখাশোনা করত। তারা মন্দির, বন্দর, বাজারগুলির যত্ন নিত। আর ঠিক করত জিনিসপত্রের দাম। নগর পরিচালনার কাজে সাহায্যের জন্য থাকত সেনাবাহিনী।

সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে মৌর্যদের সেনাবাহিনীর দরকার ছিল। সেনাবাহিনীর ওপর সম্রাটের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত। জানা যায় যে, মৌর্যদের সেনাবাহিনী ছিল বিরাট। ঘোড়া, রথ, হাতি, নৌকা প্রভৃতির ব্যবহার ছিল সেনাবাহিনীতে। সঙ্গে ছিল পদাতিক সেনা, যারা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করত। মৌর্য সম্রাটরাই প্রথম গুপ্তচরদের সাম্রাজ্যের খোঁজখবর আনতে কাজে লাগান। বিদেশি বা অচেনা সন্দেহজনক লোক সবার ওপরেই গুপ্তচরের নজর থাকত। রাজকর্মচারী এমনকি রাজপুত্ররাও চরদের নজরের বাইরে যেতে পারত না। সাম্রাজ্যের সব খবর চলে যেত সম্রাটের কাছে।

টুকরো কথা

মহাস্থানগড়

মহাস্থান বা মহাস্থান-গড় হলো বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার একটি প্রত্নস্থল। এখানে পাওয়া গেছে মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী-লিপিতে লেখা একটি লেখ। মৌর্য সম্রাট অশোকের লিপির সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। যার সময়কাল খ্রি:পূ: তৃতীয় শতক। মহাস্থান লেখটি লেখা হয়েছিল প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের (বর্তমান মহাস্থান) মহামাত্র -র উদ্দেশ্যে। এই লেখটি আসলে ছিল মৌর্য রাজার আদেশ। যে আদেশে কীভাবে মৌর্য রাজারা দুর্ভিক্ষের (প্রাকৃতিক বা অন্যান্য কারণে যে জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়) মোকাবিলা করবেন তার পরামর্শ দেওয়া আছে। এই 'দুর্ভিক্ষ' ছিল তিন প্রকার। পঙ্গপাল ফসল নষ্ট করার দুর্ভিক্ষ, দাবানলের দুর্ভিক্ষ এবং বন্যার ফলে দুর্ভিক্ষ।

টুকরো কথা

রাজা হওয়া কী সহজ কথা !

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলেছেন কুঁড়ে রাজার প্রজারাও কুঁড়ে হয়। রাজা যদি কাজ করেন তাহলে প্রজারাও কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই একজন রাজার রোজ কী কী করা উচিত, তার তালিকা দিয়েছেন কৌটিল্য। ২৪ ঘণ্টাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ১২ ঘণ্টায় আটরকম কাজ রাজা করবেন। সূর্য ওঠার ঠিক পর থেকে রাত পর্যন্ত সেইসব কাজ চলবে। তালিকাটা খানিকটা এইরকম দাঁড়ায় :

দিন	রাত
১) জমা খরচের হিসাব পরীক্ষা করবেন। দেশের সুরক্ষার খোঁজ খবর নেবেন।	১) গুপ্তচরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।
২) নগর ও গ্রামের জনগণের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনবেন।	২) স্নান-খাওয়া ও পড়াশোনা করবেন।
৩) স্নান-খাওয়া ও পড়াশোনা করবেন।	৩) বাজনা শুনতে শুনতে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেবেন।
৪) নগদ রাজস্ব নেবেন। বিভিন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবেন।	৪) ও ৫) ঘুমাবেন। (সবমিলিয়ে ৪½ ঘণ্টা ঘুম বরাদ্দ রাজার জন্য)
৫) মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ নেবেন, চিঠিপত্র লিখবেন। গুপ্তচরদের আনা গোপন খবর শুনবেন।	৬) বাজনার শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠবেন। শাসনের নানা পদ্ধতি নিয়ে ভাববেন। কী কী কাজ করতে হবে তা নিয়েও চিন্তা করবেন।
৬) বিশ্রাম নেবেন বা নিজের খুশিমতো কাজ করবেন। না হলে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।	৭) মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। গুপ্তচরদের বিভিন্ন কাজে পাঠাবেন।
৭) হাতি, ঘোড়া, রথ, সৈন্য-সামন্তদের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখবেন।	৮) পুরোহিতের আশীর্বাদ নেবেন। নিজের চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করবেন। প্রধান রাঁধুনি ও জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করবেন।
৮) সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী নিয়ে আলোচনা করবেন।	

ভেবে দেখো

তোমরা সারাদিনে কী কী কাজ করো? সেইসব কাজের একটা তালিকা বানাও।

বিরাট সাম্রাজ্যের শাসন চালানোর জন্য সম্রাটরা কর নিতেন প্রজাদের থেকে। মৌর্যরাই প্রথম রাজস্ব বা কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়। রাজস্বের বেশি ভাগটাই আসত কৃষি থেকে। চাষি তার ফসলের $\frac{1}{6}$ ভাগ দিত রাজস্ব হিসাবে। *বলি* ও *ভাগ* নামের দু-রকম ভূমি-রাজস্ব মৌর্য আমলেও চালু ছিল। তবে সম্রাট চাইলে কর ছাড় দিতে পারতেন। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামের *বলি* কর ছাড় দিয়েছিলেন সম্রাট অশোক। কারিগর, ব্যবসায়ী, বণিক সবার থেকে কর আদায় করত মৌর্য প্রশাসন। তবে পাটলিপুত্রে বসে বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব ছিল না। সেই সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশেও শাসনকাজের দেখভাল করার বিষয়ে সম্রাটদের ভাবতে হতো। প্রদেশের নীচে ছিল জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনকে *আহার* বলা হতো। এইভাবে সম্রাট ও তার নীচে রাজকর্মচারীদের নানা স্তরভাগ দেখা যায় মৌর্য শাসনব্যবস্থায়। সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে জনগণের ভাষা ছিল আলাদা। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্রাটের বক্তব্য বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করা হতো। সাম্রাজ্যের উত্তর অংশে ব্যবহার হতো পালি ভাষা। অন্যদিকে দক্ষিণ অংশে বক্তব্য প্রচারের ভাষা ছিল প্রাকৃত।

শুধু কর্মচারী, সেনা, গুপ্তচরদের উপরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত দাঁড়িয়ে ছিল না। মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর ধম্মনীতি বা ধর্মনীতি দিয়ে জনগণকে একজোট করতে চেষ্টা করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ করেননি অশোক। হিংসার বদলে শান্তির নীতি নেন তিনি। বৌদ্ধ রীতিনীতি তাঁর ওপরে ছাপ ফেলেছিল। মানুষ ও পশুপাখিদের ওপর হিংসা বন্ধের জন্য চেষ্টা করেন অশোক। সাম্রাজ্যের সব জায়গায় ধম্মের কথা পৌঁছে দেন তিনি।

টুকরো কথা
অশোকের ধম্ম

অশোকের ধম্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথায় বেশ কিছু মিল দেখা যায়। তবু ধম্ম বৌদ্ধ ধর্ম নয়। কারণ, অষ্টাঙ্গিক মার্গের মতো বিষয় অশোকের ধম্মে নেই। এমনকি তাতে নেই নির্বাণ লাভের কথাও। আসলে ধম্ম কতগুলো সামাজিক আচরণের ওপরেই বেশি জোর দেয়। হিংসা না করা এর মূল কথা। প্রাণীহত্যা বন্ধ করার ওপরেও জোর দিয়েছিলেন অশোক। এমনকি শিকার ও মাছ ধরার উপরেও তিনি নিষেধ জারি করেন। অশোক ঘোষণা করেন, এক প্রাণী অন্য প্রাণীর খাবার হতে পারে না। এর পাশাপাশি, দয়া, দান, সত্যকথন এইসব আচরণের কথা ধম্মে বলা হয়েছে। বাবা-মা, গুরুজনদের মেনে চলার কথাও ধম্মে বলা হয়েছে। এই উপদেশগুলো বিশেষ কারো জন্যই নয়। সব মানুষের জন্যই অশোক তাঁর ধম্মের কথা বলেন। অশোক প্রজাদের নিজের সন্তান বলেছিলেন। তাই মনে করা হতো প্রজারা পিতার মতো সম্রাটকে মানবে। সম্রাটকে মেনে চলাই ছিল মৌর্য শাসনের মূল ভিত।

টুকরো কথা
মৌর্য্য শাসন ও জঙ্গলের বাসিন্দা

মৌর্য শাসকরা বিভিন্ন ধরনের লোকেদের একটি শাসনের আওতায় আনতে চেয়েছিল। কিন্তু জঙ্গলের বাসিন্দাদের প্রতি তাদের মনোভাব ভালো ছিল না। বনে যারা থাকে তাদের **নীচ, অসভ্য** ও **বুনো** বলে ধরা হতো। অটবি মানে বন। বনে যারা থাকে তারা **আটবিক**। তারা নাকি মৌর্য সাম্রাজ্যে নানান গোলমাল পাকাত। আরেক দল বনবাসী ছিল **অরণ্যচর**। তারা ছিল ভালো ও শান্ত। তবে বনবাসীদের জনপদের অংশ ধরা হত না। গুপ্ত-চরেরা ঋষির ছদ্মবেশে বনবাসীদের উপর নজর রাখত। বন থেকে অনেক কিছু পাওয়া যেত। তাই বনের উপর সম্রাটের দখল কায়েম করার দরকার ছিল। গাছ কাটলে বা পশুপাখিদের মারলে বনবাসীদের শাস্তির কথাও বলেছিলেন সম্রাট অশোক।

৬.৩ মৌর্য শাসনের শেষ দিক, কুষাণ ও সাতবাহন শাসন

সম্রাট অশোক মারা যাওয়ার পর মৌর্য সাম্রাজ্যে নানান রকম সমস্যা দেখা দেয়। যোগ্য সম্রাটের অভাবে ছোটো রাজারা স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় নানান বিদেশি জাতি ভারতে আসতে থাকে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ নাগাদ শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে সরিয়ে রাজা হলেন পুষ্যমিত্র সুঙ্গ।

মনে রেখো

মৌর্যদের পর মগধে শুরু হলো সুঙ্গদের শাসন। পুষ্যমিত্র এবং অগ্নিমিত্র ছিলেন সুঙ্গদের দুজন প্রধান শাসক। সুঙ্গদের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে মগধের শাসক হন কাণ্বরা। চারজন কাণ্ব শাসকের কথা জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগে কাণ্বদের শাসনও শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক অবস্থা বদলে যায়। ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রিকরা ও শক-পহ্লবরা অনেক অঞ্চলে শাসন শুরু করে। যদিও কুষাণরাই শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল।

টুকরো কথা

গঙ্গারিদাই

গ্রিক ও রোমান সাহিত্যে মগধের পূর্বদিকে এক শক্তিশালী রাজ্যের কথা পাওয়া গেছে। তার নাম **গঙ্গারিদাই** বা **গঙ্গারিদ** (গঙ্গাহৃদ)। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল **গঙ্গা** বা **গ্যাঙ্গে** বন্দর-নগর। তলেমির মতে, গঙ্গানদীর পাঁচটি মুখ বা মোহনার সবটাই জুড়ে ছিল গঙ্গারিদাই । নন্দরাজাদের আমলে এই রাজ্যের সঙ্গে মগধের যোগাযোগের কথা গ্রিক লেখকরা লিখেছেন। আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় নাকি গঙ্গারিদাইয়ের সেনাবাহিনী মগধের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই রাজ্যের হস্তীবাহিনী ও যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা গ্রিক ও রোমান লেখকরা লিখেছেন। মনে হয় যে, গঙ্গারিদাই রাজ্যটিকেই পেরিপ্লাসের লেখক **গঙ্গাদেশ** বলে উল্লেখ করেছেন। এই রাজ্যের নামের মধ্যেই গঙ্গানদীকে ঘিরে তার অবস্থান বোঝা যায়। চিনা সাহিত্য ও কালিদাসের লেখার তুলনা করলে আরো একটি বিষয় উঠে আসে। তা হলো,গঙ্গাদেশ বা গঙ্গারিদাই ও বঙ্গের অবস্থান একই জায়গায়। মগধ ও গঙ্গারিদাই দুটি রাজ্যই **তামালিতেস** বা তাম্রলিপ্ত ও গ্যাঙ্গে বন্দর দুটি ব্যবহার করত। গ্রিক লেখক দিওদোরাস-এর মতে, ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস। কিন্তু গঙ্গারিদাই জাতি সবার সেরা।প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাম্রলিপ্ত বা তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়, দেগঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অনেক প্রত্ন-উপাদান পেয়েছেন। সেইসব উপাদানের সঙ্গে গঙ্গারিদাই-এর সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়।

কুষাণ কারা ?

মধ্য এশিয়া থেকে কয়েকটি যাযাবর গোষ্ঠী পশ্চিম দিকে চলে যায়। এরা এখনকার আফগানিস্তান ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে পৌঁছোয়। এদের মধ্যে ইউয়ে-ঝি গোষ্ঠীটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল কু এই য়ুয়াং। তারা ব্যাকট্রিয়ার ওপর অধিকার কায়েম করেছিল। এরাই ভারতের ইতিহাসে কুষাণ নামে পরিচিত। ধীরে ধীরে কুষাণরা এক বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন।

ছবি. ৬.৪: কুজুল কদফিসেসের তামার মুদ্রা

ছবি. ৬.৫: বিম কদফিসেসের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.৬: কনিষ্কের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.৭: হুবিষ্কের সোনার মুদ্রা

কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কৃতিত্ব ছিল কুজুল কদফিসেস-এর। কাবুল ও কাশ্মীর এলাকা তাঁর দখলে ছিল। তারপর শাসক হন কুজুলের ছেলে বিম কদফিসেস। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে বিমের শাসন ছিল। বিরাট শক্তিশালী কুষাণ শাসক হিসাবে জমকালো উপাধি নিয়েছিলেন বিম। ভারতীয় উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা তিনিই প্রথম চালু করেন।

বিমের ছেলে প্রথম কনিষ্ক কুষাণদের সেরা রাজা। অন্তত তেইশ বছর রাজত্ব করেন কনিষ্ক। ৭৮ খ্রিস্টাব্দে শাসক হন তিনি। সেই বছর থেকে *শকাব্দ* গণনা শুরু হয়। কনিষ্কের আমলে কুষাণ শাসন গঙ্গা উপত্যকার বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনকার পাকিস্তানের প্রায় পুরো অঞ্চলটাই কুষাণ শাসনের আওতায় ছিল। মথুরা পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে কুষাণ শাসন ছড়িয়ে পড়ে। কনিষ্কর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশাওয়ার। তবে, কুষাণদের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিক দেশ।

প্রথম কনিষ্কের পরে বাসিষ্ক ও হুবিষ্ক শাসক হন। আস্তে আস্তে কুষাণ শাসনের অবনতি দেখা দেয়। একসময় ব্যাকট্রিয়াও কুষাণদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ২৩০ খ্রিস্টাব্দের পরে কুষাণ শাসকদের কথা বিশেষ জানা যায় না।

টুকরো কথা

কলিঙ্গরাজ খারবেল: হাতিগুম্ফা শিলালেখ

মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। মৌর্যদের পরে কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হয়ে যায়। চেদি বংশের শাসকরা কলিঙ্গে শাসন শুরু করেন। ঐ বংশের শাসক খারবেল কলিঙ্গের প্রথম শক্তিশালী রাজা। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগে খারবেলের শাসন ছিল। হাতিগুম্ফা শিলালেখ থেকে খারবেলের বিষয়ে জানা যায়। ঐ শিলালেখতে **ভারতবর্ষ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে সেখানে ভারতবর্ষ বলতে সম্ভবত গঙ্গা উপত্যকার একটা অংশ বোঝানো হয়েছিল। তবে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম দিকেই চেদিদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন শাসন

মৌর্য সাম্রাজ্যের পরে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন শাসন দেখা গিয়েছিল। ঐ সময় দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে ও গুজরাট এলাকায় ছিল শকদের শাসন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয় ভাগে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শুরু হয়েছিল। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পরে সাতবাহন শেষ হয়ে যায়।

সাতবাহন বংশের প্রথম শাসক সিমুক-এর সময় প্রতিষ্ঠান ও নানাঘাট অঞ্চলে সাতবাহন শাসন ছিল। রাজা প্রথম সাতকর্ণি ছিলেন সাতবাহন বংশের তৃতীয় রাজা। তাঁর আমলে সাতবাহনদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। প্রায় সারা দক্ষিণ ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর ক্ষমতা। তবে সাতবাহনদের প্রধান বিপক্ষ ছিল পশ্চিম ভারতের শক-ক্ষত্রপ শক্তি। এই সময় দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে শক-সাতবাহন লড়াই জরুরি হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে এই লড়াইয়ে শক শাসক নহপান সফল হয়েছিলেন।

সাতবাহনদের ক্ষমতা ফিরে এসেছিল গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির আমলে। পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্যে তাঁর শাসন ছিল। শক-ক্ষত্রপদের হারিয়ে গুজরাটের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে এবং মালবেও গৌতমীপুত্রের অধিকার কায়েম হয়। তাঁর আমলের *নাসিক লেখ* ও *কার্লে লেখ* থেকে তাঁর রাজ্যবিস্তারের কথা জানা যায়।

অন্য একটি শক-ক্ষত্রপ গোষ্ঠীর সঙ্গেও সাতবাহনদের লড়াই বেধেছিল। ঐ গোষ্ঠীর বিখ্যাত শাসক ছিলেন রুদ্রদামন। তিনি *মহাক্ষত্রপ* উপাধি নিয়েছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব জানা যায় জুনাগড়ে পাওয়া একটি শিলালেখ থেকে। শক-ক্ষত্রপ শাসকদের ক্ষমতা উজ্জয়িনী থেকে গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

শক-সাতবাহন লড়াইয়ের পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক — দুই দিকই ছিল। বিশেষ কয়েকটি এলাকার ওপর দুটি শক্তিই দখল কায়েম করতে চেয়েছিল। তেমন একটি এলাকা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম মালব। পূর্ব মালবে কোসা এলাকায় একটি হিরের খনি ছিল। পশ্চিম মালবের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র-বাণিজ্য হতো। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল দিয়ে রোম-ভারত বাণিজ্য চলত। ফলে ঐ এলাকাগুলির দখল নিয়ে শক ও সাতবাহনদের লড়াই চলেছিল।

ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো রাজবংশ গড়ে উঠেছিল।

কুষাণ এবং সাতবাহন শাসন পদ্ধতি

প্রাচীন চিনের সম্রাটরা নিজেদেরকে *দেবতার পুত্র* বলতেন। কুষাণরা আদতে চিন থেকে এসেছিলেন। হয়তো সেজন্যই চিন সম্রাটদের মতো তাঁরাও নিজেদের *দেবপুত্র* অর্থাৎ দেবতার পুত্র বলে ঘোষণা করতেন। বিম কদফিসেস *দমঅর্ত* বা *বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা* উপাধি নিয়েছিলেন। কনিষ্ক উপাধি নিয়েছিলেন *মহারাজা রাজাধিরাজ দেবপুত্র শাহী*। কুষাণদের মুদ্রায় সম্রাটের মাথার পিছনে এক রকমের জ্যোতির্বলয় দেখা যায়। তেমন জ্যোতির্বলয় দেবতাদের মাথার পিছনেও খোদাই

টুকরো কথা

নাসিক লেখ

মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পাওয়া গেছে দু-টি লেখ। একটি গৌতমী-পুত্র সাতকর্ণির রাজত্বের ১৮ বছরের, অন্যটি ২৪ বছরের। শকদের ধ্বংস করে গৌতমীপুত্র সাতবাহনদের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন। মনে হয় যে তিনি নাসিক এলাকার উপর ফের শাসন কায়েম করেছিলেন। মুদ্রা থেকেও এই কথা প্রমাণ হয়। পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পুরো দাক্ষিণাত্য তিনি অধিকার করেছিলেন। শকক্ষত্রপ নহপানের বিরুদ্ধে সফল হলেও, কার্দমক বংশের শক রাজা চষ্টনের কাছে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি পরাজিত হয়েছিলেন।

মানচিত্র ৬.২ : ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি রাজশক্তি

(খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক)

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

করা হতো। সম্রাট ও দেবতাদের একই বোঝানোর জন্য শাসকরা নানান উদ্যোগ নিতেন। তেমনই একটি উদ্যোগ ছিল *দেবকুল* প্রতিষ্ঠা। বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যে নানারকমের মানুষ বাস করতো। তাদের সবাইকে একজোট করার জন্যই শাসককে দেবতার মতো প্রচার করা হতো। দেবকুল মন্দিরের মতোই একটা পুজোর জায়গা। সেখানে কুষাণ সম্রাটের মূর্তিও রাখা হতো। মথুরায় একটি দেবকুল ছিল। সেখানে সম্রাট বিমের সিংহাসনে বসা মূর্তি পাওয়া গেছে। সম্ভবত প্রথম কনিষ্কের মাথা ভাঙা মূর্তিটি ঐ দেবকুলেই ছিল।

কুষাণ শাসনে লক্ষ করার মতো বিষয় হলো দুজনে মিলে রাজ্যপাট চালানো। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাবা ও ছেলে একসঙ্গে শাসন কাজ চালাতেন। শাসন ব্যবস্থার সুবিধের জন্য সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হতো কতগুলি প্রদেশে। সেই প্রদেশের শাসককে বলা হতো *ক্ষত্রপ*।

সাতবাহন শাসন ব্যবস্থায়ও প্রধান ছিলেন রাজা। তিনি আবার সেনাবাহিনীরও প্রধান ছিলেন। কুষাণদের মতোই সাতবাহন শাসকরা শাসনের সুবিধের জন্য বড়ো অঞ্চলকে ছোটো প্রদেশে ভাগ

করেছিলেন। সাতবাহন শাসনে প্রদেশের দায়িত্বে থাকত অমাত্য নামের রাজকর্মচারী। ভাগ ও বলি — দু-রকম করই নেওয়া হতো। উৎপন্ন ফসলের $\frac{1}{6}$ অংশ ভাগ হিসাবে নেওয়া হতো। বাণিজ্যিক লেনদেনের থেকে কর আদায় করা হতো। কুষাণ-সাতবাহন আমলে বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। ফলে কারিগর ও বণিকদের থেকে শাসকরা কর আদায় করতেন। বণিকদের থেকে নগদ কর নেওয়া হতো সাতবাহন আমলে। সাতবাহন শাসকরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে জমি দিলে তার কর নিতেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো কর মকুব করা হতো। মৌর্যদের মতোই কুষাণ ও সাতবাহন শাসকরা নুনের ওপর কর বসিয়েছিলেন।

রাজতান্ত্রিক শাসনের পাশাপাশি অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শাসনও ছিল। মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে অরাজতান্ত্রিক গণসংঘগুলি টিকে ছিল। এরা নিজেদের তামার মুদ্রা চালু করেছিল। রাজশক্তিগুলির সঙ্গে গণসংঘগুলির লড়াই এই পর্যায়েও চলেছিল।

টুকরো কথা
কনিষ্কের মূর্তি

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মথুরার কাছে একটি ক্ষেত থেকে একটি মূর্তি পাওয়া যায়। সেটার মাথা ও বাহু ভাঙা ছিল। দেখে সেটাকে একজন যোদ্ধা রাজার মূর্তি বলেই মনে হয়েছিল। মূর্তির ডান হাতে একটা রাজদণ্ড ধরা রয়েছে। বাঁ-হাতের মুঠোয় কারুকাজ করা তলোয়ারের বাঁট। লম্বা, হাঁটু পর্যন্ত কোট রয়েছে তার গায়ে। কোমরে বেল্ট লাগানো। তার উপরে গোড়ালি অবধি একটা আলখাল্লা। মূর্তিটার পায়ে বুটজুতোও রয়েছে। মূর্তিটির তলার দিকে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা রয়েছে। তার থেকে জানা যায় সেটা কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের মূর্তি।

৬.৪ গুপ্ত সাম্রাজ্য

আনুমানিক ২৬২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তর ভারতে কুষাণ শাসন লোপ পেয়ে যায়। তারও প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পরে উত্তর ভারতে গুপ্তশক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে গুপ্ত শাসকরা *মহারাজ* উপাধি নিতেন। তবে সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে গুপ্ত শাসকরা *মহারাজাধিরাজ* উপাধি নিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্তদের শাসন ক্ষমতা অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শাসক হন। ঐ সময় থেকেই *গুপ্তাব্দ* গোনা শুরু হয়। মধ্যগঙ্গা উপত্যকার ওপর ভিত্তি করেই গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সম্ভবত ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসন চলেছিল।

পরবর্তী শাসক সমুদ্রগুপ্তের আমলে (আনুমানিক ৩৩৫ থেকে ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ) গুপ্ত সাম্রাজ্য সবথেকে বড়ো আকার পেয়েছিল। উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তের নয়জন শাসককে হারিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত। অরণ্য বা আটবিক রাজ্যগুলিও তাঁর অধীনে এসেছিল। এর ফলে পূর্বে রাঢ় থেকে পশ্চিমে গঙ্গা উপত্যকার ওপরের অংশ পর্যন্ত গুপ্ত শাসন ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতেও বারোজন রাজাকে হারিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত।

সুদূর দক্ষিণে তামিলনাড়ুর উত্তর-পূর্ব অংশ পর্যন্ত গুপ্ত শাসকের অধিকার কায়েম হয়েছিল। তবে দক্ষিণ ভারতে বারো জন রাজাকে শেষ পর্যন্ত রাজত্ব ফিরিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে শাসন টিকিয়ে রাখা সম্রাটের পক্ষে বোধহয় সম্ভব ছিল না। সে সময়ের কয়েকটি রাজশক্তি সমুদ্রগুপ্তকে কর দিত। তাদের বলা হতো *করদ* রাজ্য।

সমুদ্রগুপ্তের ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ (৫৬ গুপ্তাব্দ) নাগাদ শাসক হন। গুজরাট অঞ্চল থেকে শক-ক্ষত্রপ শাসকদের উচ্ছেদ করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তাই তাঁকে বলা হয় *শকারি* (শক + অরি (শত্রু) = শকারি)। তাঁর আমলেই প্রথম রুপোর মুদ্রা চালু হয়। সম্ভবত শকদের হারিয়ে দেওয়ার প্রতীক হিসেবে ৪১০-৪১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঐ রুপোর মুদ্রা চালু করা হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন বেড়েছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর সম্রাট হন প্রথম কুমার গুপ্ত (৪১৪–৪৫৪/৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও ক্ষমতা আগের মতোই ছিল। তিনি সাম্রাজ্যে নানারকম মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাঁর সময়েই নালন্দা মহাবিহার স্থাপিত হয়। প্রথম কুমারগুপ্তের ছেলে স্কন্দগুপ্ত এরপর সম্রাট হন। আনুমানিক ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে হূণরা আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত সফলভাবে সেই আক্রমণ রুখে দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত শেষ গুপ্ত সম্রাট যাঁর শাসন এলাকা ছিল বিরাট। তাঁর পর থেকেই গুপ্তদের শক্তি কমতে থাকে। ছোটো ছোটো স্থানীয় শাসকরা গুপ্ত শাসকদের অমান্য করতে থাকে। ফলে উত্তর ভারতে বেশ কিছু আঞ্চলিক শাসন দেখা দেয়।

দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শাসন

উত্তর ভারতে গুপ্ত শাসনের সময়েই দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শাসন শুরু হয়েছিল। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাকাটক শক্তি দাক্ষিণাত্যে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। সাতবাহন শাসন ততদিনে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের বড়ো এলাকা জুড়ে বাকাটক শাসন ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মেয়ে প্রভাবতীগুপ্তার বিয়ে হয়েছিল বাকাটক-রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে। তার ফলে দাক্ষিণাত্যেও গুপ্ত শাসনের প্রভাব তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় রুদ্রসেন মারা যাওয়ার পর প্রভাবতীগুপ্তাই বাকাটক শাসন চালিয়েছিলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগে ক্রমশই পল্লবদের শক্তি বাড়ছিল। আনুমানিক সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ ভারতে চালুক্য ও পল্লবরাই হয়ে উঠেছিল প্রধান শক্তি। মনে রেখো, দক্ষিণের পল্লবরা কিন্তু পহ্লব বা পার্থীয়দের থেকে আলাদা।

টুকরো কথা

এলাহাবাদ প্রশস্তি

এলাহাবাদ দুর্গের ভিতরে একটি শিলালেখ আছে। লেখটি গুপ্তযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে ও সংস্কৃত ভাষায় খোদাই করা। এলাহাবাদের কৌশাম্বী গ্রামে লেখটি ছিল। পরবর্তী সময়ে মুঘল সম্রাট আকবর সেটিকে তুলে আনিয়ে এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে রাখেন। ঐ লেখটিতে প্রশস্তি খোদাই করা আছে। প্রশস্তিটি হরিষেণের লেখা। তিনি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। লেখটিতে আদতে সমুদ্রগুপ্তের গুণগান করা হয়েছে। সম্রাট হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধ, রাজ্যজয় প্রভৃতির কথা লেখটিতে আছে। পদ্য ও গদ্য দু-ভাষাতেই সেটি লেখা। যদিও সমুদ্রগুপ্তের প্রসঙ্গে শুধু ভালো কথাই লেখটিতে বলা হয়েছে। তবুও ওই সময়ের ইতিহাস জানার জন্য লেখটি জরুরি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

গুপ্ত ও বাকাটক প্রশাসন

খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি বদল ঘটেছিল। পুরো উপমহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল রাজতান্ত্রিক শাসন। অরাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি কার্যত লোপ পেয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে বৈশালী অঞ্চলে লিচ্ছবি গোষ্ঠীর গুরুত্ব ছিল। পরের দিকে বৈশালী সরাসরি গুপ্ত সম্রাটদের প্রাদেশিক শাসন

মানচিত্র ৬.৩ : গুপ্ত, বাকাটক এবং অন্যান্য কয়েকটি শক্তির শাসন এলাকা

কেন্দ্রে পরিণত হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের পর উত্তর ভারতে অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী প্রায় ছিলই না। পাশাপাশি অরণ্য অঞ্চলের আটবিক রাজ্যগুলিও সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক এলাকা হয়ে গিয়েছিল।

গুপ্ত শাসনের কাঠামোয় সম্রাটই ছিলেন প্রধান। বিরাট ক্ষমতা বোঝানোর জন্য তারা বড়ো বড়ো উপাধি নিতেন। বাকাটক রাজারা অবশ্য শুধু *মহারাজা* উপাধিই ব্যবহার করতেন। গুপ্ত সম্রাটরা অনেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখানোর

টুকরো কথা

চন্দ্ররাজার স্তম্ভ

দিল্লির কুতুব মিনারের কাছে একটি উঁচু লোহার স্তম্ভ আছে। তার গায়ে একটি লেখ খোদাই করা হয়েছিল। তাতে চন্দ্র নামে এক শক্তিশালী বিষ্ণুভক্ত রাজার যুদ্ধজয়ের বর্ণনা আছে। লেখটিতে কোনো সাল-তারিখ নেই। ঐ চন্দ্ররাজা ঠিক কে তাও পরিষ্কার করে বলা নেই। লেখটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে খোদাই করা হয়েছিল।

ঐ চন্দ্ররাজাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলেই মনে করা হয়। লেখটিও তাঁরই সমকালীন। তাছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। তবে অনেক মিল সত্ত্বেও লেখতে বলা সমস্ত অঞ্চল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত জয় করেননি। ঐ বর্ণনা অনেকটাই কাল্পনিক।

ছবি. ৬.৮: সমুদ্রগুপ্তের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.৯: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.১০: কুমারগুপ্তের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.১১: স্কন্দগুপ্তের সোনার মুদ্রা

জন্য বড়ো বড়ো যজ্ঞ করেছিলেন। কুষাণদের মতোই গুপ্ত সম্রাটরাও নিজেদের দেবতার সঙ্গে তুলনা করতেন।

সম্রাটকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন রাজকর্মচারীরা। গুপ্ত ও বাকাটক শাসনে বিভিন্ন পদ ও মর্যাদার রাজকর্মচারী ছিল। *অমাত্য* বা *সচিব* ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী। গুপ্ত সাম্রাজ্য বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। প্রদেশগুলিকে বলা হতো *ভুক্তি*, যেমন *মগধভুক্তি*। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে ভুক্তির বদলে *দেশ* শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রদেশের শাসনভার থাকত গুপ্ত রাজপুত্রদের হাতে। বাকাটক শাসনে প্রদেশগুলি *রাজ্য* নামে পরিচিত ছিল। রাজ্যের শাসকদের বলা হতো *সেনাপতি*।

প্রদেশের থেকে ছোটো জেলা অঞ্চলগুলো গুপ্ত শাসনে *বিষয়* নামে পরিচিত হতো। বাকাটক শাসনে বিষয় শব্দের বদলে জেলা অঞ্চলগুলোকে বলা হতো *পট্ট* বা *আহার*। গুপ্ত ও বাকাটক শাসনে সমস্ত শাসন ব্যবস্থাটা বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা ছিল। জেলা ও গ্রামস্তরের শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানা জনপ্রতিনিধির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসনে যুবরাজ ও রানিদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে গুপ্ত শাসনের শেষ দিকে সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

৬.৫ গুপ্তদের পর উত্তর ভারতের অবস্থা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গুপ্তদের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকল। একসময় গুপ্ত সাম্রাজ্য গেল ভেঙে। আর তার জায়গা নিল ছোটো ছোটো রাজ্য। এককেটা অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে ওঠা সেই রাজ্যগুলিকে বলা হতো *আঞ্চলিক রাজ্য*।

পুষ্যভূতিদের রাজ্য : হর্ষবর্ধনের শাসন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বড়ো সাম্রাজ্য দেখা যায়নি। পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধন সাম্রাজ্য গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গোড়ায় পুষ্যভূতিরা থানেসর বা স্থানীশ্বরের শাসক ছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের সময় থেকে পুষ্যভূতিদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রভাকরবর্ধন মারা যান। তখন তাঁর বড়ো ছেলে রাজ্যবর্ধন শাসনের দায়িত্ব পান।

এদিকে কনৌজ-মালব দ্বন্দ্বে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মা মারা যান। তাঁর সঙ্গে প্রভাকরবর্ধনের মেয়ে রাজ্যশ্রীর বিয়ে হয়েছিল। রাজ্যবর্ধন তখন মালবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহযোগী গৌড়ের রাজা

শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনও মারা যান। তখন হর্ষ কনৌজ ও স্থানীশ্বর — দুয়েরই শাসনভার নেন। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে হর্ষের সিংহাসনে বসার বছর থেকেই *হর্ষাব্দ* গোনা শুরু হয়।

হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সেই সময়ের অনেকগুলি রাজশক্তির সংঘাত হয়েছিল। মগধ জয় করে হর্ষ *মগধরাজ* উপাধি নিয়েছিলেন। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষের বিরোধ ছিল অনেকদিনের। কিন্তু শশাঙ্ককে কখনই হর্ষ সরাসরি হারাতে পারেননি। চালুক্যশাসক দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গেও হর্ষর সংঘাত হয়েছিল। পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যিক বন্দরের দখলের চেষ্টা দুজনেই করেছিলেন। তবে যুদ্ধের ফলাফল হর্ষের বিপক্ষে গেছিল। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তি আইহোল প্রশস্তি লিখেছিলেন। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যুদ্ধে হর্ষের হর্ষ (আনন্দ) ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

অনেক সামরিক অভিযান করলেও হর্ষের সব অভিযান সফল হয়নি। হর্ষকে *সকলোত্তরপথনাথ* (উত্তর ভারতের সমস্ত পথের প্রভু) বলা হয়েছে। কিন্তু আদতে সমস্ত উত্তর ভারতে হর্ষের শাসন ছিল বলে মনে হয় না। তবে উত্তর ভারতে শেষ বড়ো অঞ্চলের শাসক হিসাবে হর্ষবধনই সবথেকে বিখ্যাত। তিনি *শিলাদিত্য* উপাধি নিয়েছিলেন।

শাসনব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন হর্ষবর্ধন নিজে। তাঁকে সাহায্য করত মন্ত্রীপরিষদ। এছাড়াও অমাত্যদের হাতে রাজকাজের দায়িত্ব থাকত। টানা যুদ্ধ করে চলার কারণে হর্ষের সেনাবাহিনীও ছিল বিরাট।

এই সমস্ত শাসনকাজের জন্য দরকারি সম্পদ আসত কর থেকে। জমিতে উৎপাদিত ফসলের $^1/_6$ অংশ কর নেওয়া হতো। তাছাড়া বণিকদের থেকে কর আদায় করা হতো। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বিনা করে জমি দান করা হতো।

প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে গুপ্ত শাসনের কাঠামোই হর্ষের আমলেও দেখা যায়। সম্ভবত শাসনের কাজ চালানোর জন্য মন্ত্রীদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটি পরিষদ তাঁকে সাহায্য করত। দূরের প্রদেশগুলি শাসন করতেন সামন্ত রাজা বা রাজার কোনো প্রতিনিধি। প্রতিটি *প্রদেশ* বা *ভুক্তি* কয়েকটি *বিষয়* বা *জেলায়* বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থায় সবচাইতে নীচে ছিল গ্রামগুলি।

হর্ষের মৃত্যুর পর পুষ্যভূতি শাসন লোপ পায়। বিভিন্ন ছোটো ছোটো শাসকরা হর্ষের অধীনের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেয়।

টুকরো কথা

বাণভট্টের হর্ষচরিত

বাণভট্ট হর্ষবর্ধনকে নিয়ে **হর্ষচরিত** কাব্য লেখেন। এটি আদতে একটি প্রশস্তি কাব্য। অর্থাৎ এই কাব্যে হর্ষের কেবল গুণগান করা হয়েছে। পাশাপাশি পুষ্যভূতিদের রাজত্ব ও তার ইতিহাস আলোচনা করেছেন বাণ। হর্ষের গুণগান করতে গিয়ে তাঁর বিরোধীদের ছোটো করেছেন বাণ। যেমন, রাজা শশাঙ্ককে অনেকভাবে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের বোন রাজ্যশ্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হর্ষচরিত শেষ হয়েছে। হর্ষচরিত আসলে হর্ষবর্ধনের আংশিক জীবনী। তবে শুধু গুণগানের জন্য এটিকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নেওয়া মুশকিল।

টুকরো কথা

সুয়ান জাং-এর বর্ণনায় হর্ষবর্ধন, বৌদ্ধ সম্মেলন ও প্রয়াগের মহাদান

সপ্তম শতকের প্রথমভাগে চিনা বৌদ্ধ ভিক্ষু সুয়ান জাং ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন **সি-ইউ-কি** গ্রন্থে। সুয়ান জাং-এর লেখায় হর্ষবর্ধনের প্রসঙ্গে অনেক কথা আছে। তবে হর্ষের প্রতি সুয়ান জাং-এর পক্ষপাতিত্ব ছিল। হর্ষের নানা গুণগান করেছেন তিনি। তাঁর বেশ কিছু বর্ণনা বাস্তব বলে মনে হয় না।

সুয়ান জাং কনৌজে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। তার পাশাপাশি ছিল দেবমন্দির। সুয়ান জাং হর্ষের বৌদ্ধ ধর্মের প্রীতির কথাই বেশি বলেছেন। অন্যদিকে বাণভট্টের লেখায় হর্ষকে শিবভক্ত বলে বলা হয়েছে।

সুয়ান জাং লিখেছেন, হর্ষবর্ধন প্রতি বছর একটা বৌদ্ধ সম্মেলন আয়োজন করতেন। সেখানে একুশ দিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলত। যারা ভালো কাজ করত তাদের পুরস্কার দেওয়া হতো। খারাপ কাজের জন্য রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। প্রয়াগে হর্ষের মহাদানক্ষেত্র ও উৎসব নিয়েও লিখেছেন সুয়ান জাং। মহাদানক্ষেত্রে বুদ্ধের ও শিবের মূর্তি বসানো হতো। আট দিন ধরে নানা জিনিস দান করা হতো। তার ফলে নাকি হর্ষের পাঁচ বছরের জমানো সব সম্পদ শেষ হয়ে যেত। সব দান করে দিয়ে হর্ষ কেবল একটা পুরোনো পোশাক পরতেন। তারপর বুদ্ধের পুজো করে উৎসব শেষ হতো। সুয়ান জাং শুনেছিলেন হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বছরে এই উৎসব করতেন।

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। **নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :**

১.১) সেলুকাস ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে চিরকাল শত্রুতা ছিল।

১.২) মৌর্য আমলে মেয়েরাও মহামাত্যের দায়িত্ব পেতেন।

১.৩) কুষাণরা এদেশেরই মানুষ ছিলেন।

১.৪) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তাব্দ গোনা চালু করেন।

২। **নীচের বিবৃতিগুলির সঙ্গে কোন ব্যাখ্যাটি সবথেকে বেশি মানানসই বেছে বের করো :**

২.১) বিবৃতি : অশোক তাঁর সাম্রাজ্যে পশুহত্যা বন্ধ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ১- তাঁর রাজ্যে পশুর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য।

ব্যাখ্যা : ২- ধম্মের অনুসরণ করার জন্য ।

ব্যাখ্যা : ৩- পশুবাণিজ্য বাড়ানোর জন্য।

২.২) বিবৃতি : কুষাণ সম্রাটরা নিজেদের মূর্তি দেবকুলে রাখতেন।

ব্যাখ্যা : ১- তাঁরা ছিলেন দেবতার বংশধর।

ব্যাখ্যা : ২- তাঁরা প্রজাদের সামনে নিজেদের দেবতার মতোই সম্মাননীয় বলে হাজির করতেন।

ব্যাখ্যা : ৩- তাঁরা দেবতাকে খুব ভক্তি করতেন।

২.৩) বিবৃতি : গুপ্ত সম্রাটরা বড়ো বড়ো উপাধি নিতেন।

ব্যাখ্যা : ১- উপাধিগুলি শুনতে ভালো লাগত।

ব্যাখ্যা : ২- উপাধিগুলি প্রজারা দিত।

ব্যাখ্যা : ৩- সম্রাটরা এর মাধ্যমে নিজেদের বিরাট ক্ষমতাকে তুলে ধরতেন।

২.৪) বিবৃতি : সুয়ান জাং চিন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ১- ভারতীয় উপমহাদেশে বেড়ানোর জন্য।

ব্যাখ্যা : ২- হর্ষবর্ধনের শাসন বিষয়ে বই লেখার জন্য।

ব্যাখ্যা : ৩- বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করার জন্য।

৩। **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :**

৩.১) কলিঙ্গযুদ্ধের ফলাফলের সঙ্গে অশোকের ধম্মের কী সম্পর্ক? ধম্ম তাঁর শাসনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

৩.২) মৌর্য সম্রাটরা গুপ্তচর কেন নিয়োগ করতেন?

৩.৩) মৌর্য সম্রাট ও গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার তুলনা করো।

৪। **হাতেকলমে করো :**

মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত আমলের মুদ্রাগুলির তুলনা করলে কী কী মিল-অমিল দেখা যাবে?

৭

অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ

রাজা-সম্রাটদের কথা শুনতে ভালো লাগে। তবে খালি রাজাদের কাজকর্মের কথাই শুনতে ভালো লাগে না বুবির। দাদুকে তাই পাকড়াও করল সবাই। আজ ওদের সবাইকে গল্প শোনাতে হবে। তবে রাজার বা রূপকথার গল্প নয়। এমনি লোকজনের গল্প। দাদু বললেন, বেশ তাই হোক। বলেই সটান বসে গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলেন। ওরা চিরকাল/ টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল। / ওরা মাঠে মাঠে/ বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।/ ওরা কাজ করে/ নগরে প্রান্তরে। দাদুর মুখে আবৃত্তি শুনছে সবাই। আবার বললেন দাদু, রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;/ জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে, —ওমা হঠাৎ গল্পের কথায় কবিতা চলে এল। এর মানে কী? দাদু বুঝিয়ে বললেন, এই কবিতায় *ওরা* মানে সাধারণ মানুষ। তারা চিরদিনই নিজের নিজের কাজ করে যায়। ক্ষেতে ফসল ফলায়। নৌকা চালায় নদীতে। নগর বা গ্রাম সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষের কাজকারবার চলতে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্য বেশি দিন থাকে না। একজন শাসক হয়। বেশ কিছু বছর তার শাসন চলে। তারপর অন্যজন শাসক হয়ে বসে। একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। অন্য সাম্রাজ্য তৈরি হয়। রাজছত্র সেই সাম্রাজ্যের প্রতীক। তাই *রাজছত্র* সাম্রাজ্যের সঙ্গেই ভেঙে যায়। সাম্রাজ্য থাকলে যুদ্ধও থাকে। কিন্তু সেইসব যুদ্ধও একদিন থেমে যায়। *রণডঙ্কা* মানে যুদ্ধের (রণ) বাজনা (ডঙ্কা)। সেসবের শব্দ আর শোনা যায় না।

যুদ্ধে জিতে জয়ীরা উঁচু করে স্তম্ভ বানায়। সেই স্তম্ভও একসময় ভেঙে পড়ে। না ভাঙলেও তার জৌলুস কমে যায়। অর্থাৎ সম্রাট, সাম্রাজ্য, যুদ্ধ, যুদ্ধে জয় সব একসময় ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু, চাষি তার ক্ষেতে বীজ বোনে। পাকা ফসল কাটে। সেই ফসল একসময়ে সম্রাটের পেট ভরাত। কারণ সম্রাট তো নিজে চাষ করতেন না। আজও চাষির ফলানো ফসল আমাদের পেট ভরায়।

এই বলে দাদু ফের আবৃত্তি করলেন। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ— 'পরে/ওরা কাজ করে।/—শেষে বললেন, আজ সম্রাটও নেই, সাম্রাজ্যও নেই। কিন্তু চাষি আছে, কারিগর শিল্পীরা আছে। এরাই সমাজ চালায়। এরাই খাদ্য উৎপাদন করে। আমাদের রোজকার প্রয়োজন মেটায়। আমরা সবাই এই 'ওরা'-র ভিতরে পড়ি। আমরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু আমাদের সবার নাম বিখ্যাত নয়। রাজা সম্রাটদের নাম অনেকেই জানে। কিন্তু সম্রাট অশোকের রথ চালাতেন কে? তার নাম কেউ জানে না। এসব শুনে অরুণ বলল, সত্যি এটা ভারি অন্যায়! রাজাদের কথা কত ফলাও করে বলা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা তো ঢাক পিটিয়ে বলা হয় না। তাদের নামও আমরা জানতে পারি না। তখন সবাই মিলে ঠিক করল স্কুলে গিয়ে স্যারকে বলবে এসব।

পরদিন স্যার সব শুনলেন। বললেন, এবারে তাহলে প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের কথাই আলোচনা হোক । সাধারণ মানুষকে নিয়েই সমাজ তৈরি হয়। তাদের কাজকর্মের ফলেই সম্পদ তৈরি হয়। সেই সম্পদে চলত রাজার, সম্রাটের শাসন। এবারে তাহলে সেই সমাজ, অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের কথাই শুরু হোক। তোমরা তো খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ষোলোটা মহাজনপদের কথা জেনেছ। ঐ সময় থেকেই শুরু করা যাক।

৭.১ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক : ষোড়শ মহাজনপদের আমল

মহাজনপদগুলির আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনীতি ও সমাজও বদলে গিয়েছিল। জনপদ বলতে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অঞ্চলকেও বোঝায়। ফলে জনপদ ও মহাজনপদে কৃষিজীবী জনবসতিও ছিল। মহাজনপদগুলিতে রাজকর্মচারী ও যোদ্ধাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় সম্পদ কৃষি থেকেই আসত। বেশিরভাগ মহাজনপদ গঙ্গা উপত্যকায় ছিল। ঐ অঞ্চলের নদীগুলিতে বছরের বেশিরভাগ সময়ই জল থাকত। তার সঙ্গে ছিল যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি। এর ফলে ঐ অঞ্চলের উর্বর মাটি চাষের পক্ষে ভালো ছিল।

কৃষিকাজ ছিল সেই সময়ের প্রধান জীবিকা। সেযুগের বিভিন্ন লেখায় চাষের কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। উর্বরতা অনুযায়ী জমির নানারকম ভাগ করা হতো। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল ফলানো হতো। ঋতু অনুযায়ী ফসলগুলির আলাদা আলাদা নামও ছিল। কৃষিতে ধানই ছিল প্রধান ফসল। ধানের মধ্যে সেরা ছিল শালি ধান। মগধ অঞ্চলে শালি ধানের চাষ বেশি ছিল। কৃষিজ ফসলের মধ্যে গম, যব ও আখের ফলনও হতো।

আগের মতো জমির উপর সবার সমান অধিকার আর ছিল না। কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে অনেক জমির অধিকার ছিল। এর পাশাপাশি ছিল জমিহীন কৃষক। কৃষির পাশাপাশি পশুপালনও হতো। কৃষির জন্য গবাদি পশুর প্রয়োজন ছিল। সেজন্য খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পর থেকে গবাদি পশু বলি দেওয়া কমতে থাকে।

টুকরো কথা

উত্তর ভারতের কালো চকচকে মাটির পাত্র

গৌতম বুদ্ধের সময়ে একরকম মাটির পাত্র বানানোর শিল্প খুব উন্নত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা যেগুলিকে **উত্তর ভারতের কালো চকচকে মাটির পাত্র** বলেন। এই পাত্রগুলি আগের আমলের ধূসর মাটির পাত্রগুলির থেকেও উন্নত। খুব ভালো মানের মাটি দিয়ে এই পাত্রগুলি তৈরি হতো। কুমোরের চাকার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এই পাত্র বানানো সহজ হয়। পাত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলি আয়নার মতো চকচকে। মাটির পাত্রগুলিকে ভালো চুল্লির আঁচে পুড়িয়ে কালো করা হতো। পোড়ানোর পর পাত্রগুলি পালিশ করা হতো। এই মাটির পাত্রের নজির হিসাবে থালা ও নানা রকমের বাটি পাওয়া গেছে।

এই সময়ে কারিগরি শিল্প ও নানারকম পেশার বিবরণও পাওয়া যায়। এই সময়ের লোহার জিনিসপত্র প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ছিল যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। তাছাড়া দা, কুড়ুল, কুঠার ও কিছু লাঙলের ফলাও পাওয়া গেছে। লোহার কুড়ুল ও কুঠার দিয়ে সহজেই ঘন জঙ্গল কাটা যেত। তার ফলে বসতি ও কৃষি জমি বাড়ানো সহজ হয়। মহাজনপদগুলি যুদ্ধের কাজে লোহার অস্ত্রের ব্যবহার করতো। মধ্যগঙ্গা উপত্যকায় বেশ কয়েকটি অঞ্চলে আকরিক লোহা পাওয়া যেত। দক্ষিণ ভারতে লোহার জিনিসপত্র কৃষিকাজে ব্যবহার হতো। তবে লোহার তৈরি লাঙলের ফলার ব্যবহার দক্ষিণ ভারতে এই সময় হয়নি। বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে খুব বিখ্যাত ছিল বারাণসী। গয়না বানানোর শিল্পও এইসময় লক্ষ করা যায়। দামি ও আধাদামি নানারকম পাথর ও পুঁতির গয়না বানানোর কাজে ব্যবহার হতো।

কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি বাণিজ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। এই সময়ে বাণিজ্যের উন্নতি হয়। মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ধনী বণিকদের পাশাপাশি ছোটো দোকানদার ও ব্যবসায়ীও ছিল। অনেক গোরুরগাড়ি বোঝাই করে দূরদূরান্তে বাণিজ্যে যেতেন কিছু বণিক। গোরু ও ঘোড়ার বাণিজ্য চলত। উত্তর ভারতে স্থলপথে ও নদীপথে বাণিজ্য করা সহজ ছিল। সেই তুলনায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য হতো কম। ব্যবসা করতে গেলে ধার দেওয়া-নেওয়া ছিল জরুরি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে তার জন্য ছাড় দেওয়াও হয়েছিল। তবে ধার নিয়ে তা শোধ দেওয়া উচিত বলে মনে করা হতো। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এই সময় ধাতুর মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। *কার্ষাপণ* ছিল বহু প্রচলিত এক ধরনের মুদ্রা। গোল ও চৌকো আকৃতির অনেক রুপোর মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ থেকে বোঝা যায় ব্যবসাবাণিজ্যও এইসময় বেড়েছিল। তবে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এই সময়ের মুদ্রা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম নগর দেখা গিয়েছিল হরপ্পা সভ্যতায়। তাই তাকে বলে প্রথম নগরায়ণ। তার প্রায় হাজার বছরেরও পরে আবার নগর গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই নগরায়ণ মূলত হয়েছিল উত্তর ভারতে বিশেষত গঙ্গা উপত্যকায়। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ নাগাদ হওয়া এই নগরায়ণ *দ্বিতীয় নগরায়ণ* বলে পরিচিত। সেযুগের লেখায় গ্রাম ও নগরের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বেশিরভাগ মহাজনপদের রাজধানীগুলিই ছিল বিখ্যাত নগর। নগরগুলি ছিল পাথর, মাটি বা ইট দিয়ে বানানো প্রাকার দিয়ে ঘেরা।

নগরগুলি গ্রামীণ বসতির তুলনায় আকারে বড়ো ছিল। শাসন ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকেরা প্রধানত নগরে থাকত। এরা কেউই নিজেরা নিজেদের

খাদ্য উৎপাদন করত না। ফলে এদের জন্য নিয়মিত খাদ্য আসত গ্রাম থেকে। তাই নগরগুলো গড়ে উঠত গ্রামীণ এলাকার কাছাকাছি। নতুন নগর তৈরি হওয়ার ফলে বেশ কিছু নতুন জীবিকারও খোঁজ পাওয়া যায়। এই সময় উত্তর ভারতে ধোপা, নাপিত ও চিকিৎসকের (বৈদ্য) জীবিকা খুব পরিচিত ছিল।

পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের পরে। নারীদের শিক্ষার সুযোগ ক্রমেই কমে গিয়েছিল। বালিকা বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সমাজে বেড়ে যায়। তবে নারীদের প্রতি বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় কিছুটা উদার ছিল।

৭.২ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ : মৌর্য আমল

মৌর্য আমলেও সমাজে ধনী ও দরিদ্র এবং অন্যান্য ভেদাভেদ ছিল। নারীদের সাধারণ অবস্থা মৌর্য আমলেও আগের মতো ছিল। তবে ঘরকন্নার কাজের বাইরেও নারীরা কয়েকটি পেশায় যোগদান করতে পারতেন। সুতো উৎপাদনের কাজে নারী শ্রমিকদের কথা জানা যায়। গুপ্তচর ও রাজকর্মচারী হিসাবেও নারীদের নিয়োগ করা হতো।

মৌর্য আমলেও অর্থনীতি মূলত কৃষির উপরেই নির্ভর করত। বহু নদী থাকার জন্য ও বছরে অন্তত দু-বার বর্ষার ফলে জমি উর্বর থাকত। নানারকম ও পরিমাণে অনেক ফসলের কথা জানা যায়। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আবাদি এলাকা বাড়ানোর দিকেও সেযুগে নজর দেওয়া হতো।

কারিগর ও বণিকদের কাজের তদারকি করত রাষ্ট্র। খনি ও খনিজ সম্পদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার ছিল একচেটিয়া। খনিগুলির দেখভালের জন্য রাজকর্মচারী বহাল করা হতো। নুনকেও খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ধরা হতো। সুতো ও মুদ্রা তৈরির শিল্পেও রাষ্ট্রের তদারকি চলত। তবে সবক্ষেত্রে এই তদারকি একই রকম ছিল না।

ব্যবসার নানা দিক সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার জন্য আলাদা রাজকর্মচারী থাকত। মৌর্য আমলে রাজধানীর সঙ্গে সাম্রাজ্যের নানা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছিল। নিয়মিত রাজপথের দেখাশোনা করার জন্য রাজকর্মচারী থাকত। পথের পাশে দূরত্ব ও দিক বোঝানোর ফলক লাগানো হতো। সেগুলি ছিল অনেকটা আজকের মাইল ফলকের মতো।

ছবি. ৭.১: প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের নানারকম মুদ্রা

টুকরো কথা

মেগাস্থিনিসের চোখে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

মেগাস্থিনিস ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজের চারটি বর্ণের কথা জানতেন না। তবে পেশাদার বা বৃত্তিজীবী নানা জাতি তিনি দেখেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতের জনসমাজ সাতটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। যেমন— ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত, কৃষক, পশুপালক ও শিকারি, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, গুপ্তচর বা পর্যটক এবং সচিব বা মন্ত্রী। মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, ভারতে দাসপ্রথা ছিল না।

মেগাস্থিনিসের মতে, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা নগরে বাস করত না। তারা কখনও অন্য কোনো জাতিকে আক্রমণ করে না। অপর জাতিরাও ভারতবাসীদের আক্রমণ করত না। আলেকজান্ডারই একমাত্র যিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মেগাস্থিনিসের মতে, ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি। তবে মেগাস্থিনিসের সব কথাগুলি কিন্তু ঠিক নয়।

???

ভেবে দেখো

বৈদিক সমাজের সঙ্গে মৌর্য আমলের সমাজের কী কী মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়া যায়?

মৌর্য আমলে সাধারণ পুরুষেরা অনেকটা আজকের ধুতি-চাদরের মতো পোশাক পরতেন। মহিলারা পোশাকের উপর চাদর বা ওড়না ব্যবহার করতেন। ধনী ও রাজপরিবারের নারী-পুরুষ দামি পোশাক পরতেন। সুতির কাপড়ের চাহিদা সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। পশম ও রেশমের কাপড়ের ব্যবহার ছিল বলেও জানা যায়। পুরুষেরা অনেকেই মাথায় পাগড়ি পরতেন। দামি পাথর ও সোনার তৈরি গয়না পরতেন ধনীরা।

মাটি, পাথর, ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরি হতো ঘরবাড়ি। ঘরের ভিতরে ও বাইরে পলেস্তারা লাগানো হতো। অনেকে ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকাতেন। আসবাবপত্রের মধ্যে খাট বা চৌকি, মাদুর, তোশক, চাদর, বালিশ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল।

৭.৩ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত : কুষাণ আমল

অর্থনীতি ও সমাজের নিরিখে এই পাঁচশো বছরে বেশ কিছু বদল লক্ষ করা যায়। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়েছিল এই সময়। উত্তর ভারতে আগের মতো কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ধান, গম, যব, আখ, কার্পাস ছিল প্রধান ফসল। দাক্ষিণাত্যের কালোমাটিতে তুলোর চাষ বেশি হতো। কেরালায় গোলমরিচের ফলন ছিল বিখ্যাত। কৃষিকাজে নানান রকমের উপকরণের

ব্যবহার এই সময় দেখা যায়। মাটি খুঁড়ে লোহার লাঙল, কোদাল, কুঠার, দা প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই সময়ে সমস্ত জমির উপর সম্রাটের মালিকানা ছিল না। বরং অনেক জমিরই মালিক ছিলেন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি।

টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের জলসেচ ব্যবস্থা

কৃষিকাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজন ভালো সেচ ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শাসকরা সেদিকে নজর দিতেন। নদীর জল সেচের মাধ্যমে ক্ষেতে পৌঁছে দিতে নানান উদ্যোগ নেওয়া হতো। জলসেচ প্রকল্পগুলিকে **সেতু** বলা হতো। এই সেতু ছিল দু-ধরনের। এক ধরনের সেতু প্রাকৃতিক জলের উৎসকে ভিত্তি করে থাকত। আবার কৃত্রিম উপায়ে অন্য এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় জল আনিয়েও সেতু বানানো হতো। সেতুর জল ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের জলকরও দিতে হতো। ধনী ব্যক্তিরাও নিজেদের উদ্যোগে জলসেচ প্রকল্প তৈরি করতেন।

কুষাণ আমলে সেতুর ক্ষতি করলে শাস্তি দেওয়ার কথাও জানা যায়। কূপ বা জলাশয় বানিয়ে দেওয়া ভালো কাজ বলে ধরা হতো। সেচকাজে একধরনের যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। যন্ত্রটি চাকার মতো, তার গায়ে ঘটি লাগানো থাকত। বড়ো কূপ বা জলাশয়ে যন্ত্রটি বসানো হতো। চাকাটি ঘুরিয়ে ঘটিগুলো দিয়ে কূপের জল বাইরে আনা হতো। ঐ যন্ত্র বানানো ও সারানোর কারিগরও ছিল।

গুপ্ত আমলে কৃষিকাজ বাড়ার সঙ্গে সেচব্যবস্থার উন্নতির যোগাযোগ দেখা যায়। তাম্রলেখগুলিতে গ্রামে পুকুর বা তড়াগ খোঁড়ার কথা পাওয়া যায়। সেচের উন্নতিতে রাজা নজর দিতেন। পাশাপাশি ধনী ব্যক্তিরাও নিজেদের উদ্যোগে জলসেচের ব্যবস্থা করে দিতেন।

সুদর্শন হ্রদ

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে রাজকীয় উদ্যোগে জলসেচ ব্যবস্থার একটা প্রধান উদাহরণ সুদর্শন হ্রদ। মৌর্য আমল থেকে গুপ্ত আমল পর্যন্ত ঐ হ্রদের ব্যবহার ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে ঐ হ্রদটি বানানো হয়েছিল। **ওয়াড়** কথার মানে শহর। এটি একটি নদীভিত্তিক বড়ো মাপের সেচ প্রকল্প (সেতু)। অশোকের শাসনকালে সেচ প্রকল্পটিতে কয়েকটি সেচ খালও যোগ করা হয়। শকশাসক রুদ্রদামন ঐ হ্রদটির সংস্কার করেন (১৫০ খ্রিস্টাব্দ)। বাঁধটিকে আরো বড়ো ও শক্ত করা হয়। এই পুরো কাজের বর্ণনা রুদ্রদামন জুনাগড়ে একটি শিলালেখতে খোদাই করিয়েছিলেন। গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের শাসনের প্রথম বছরেই আবার হ্রদটি মেরামতির দরকার হয় (১৩৬ গুপ্তাব্দ বা ৪৫৫/৪৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত সুদর্শন হ্রদের টানা ব্যবহার হয়েছিল।

এই পাঁচশো বছরে উপমহাদেশের ভিতরে ও বাইরে বাণিজ্যের বিকাশ দেখা যায়। বাণিজ্যের উন্নতিতে জলপথ ও স্থলপথগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিদেশের বাজারে উপমহাদেশের মসলিন ও অন্যান্য কাপড়ের চাহিদা ছিল। তাছাড়া হিরে, বৈদূর্য, মুক্তো ও মশলার কদর বিদেশের বাজারে ছিল। চিনের

রেশম ছিল আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। কাচের তৈরি জিনিসপত্রও বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। এই আমলে কারিগরি শিল্প ও পেশার বৈচিত্র্য অনেক বেড়েছিল। বারাণসী ও মথুরা দামি কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন বাংলার সূক্ষ্ম সুতির কাপড় মসলিনের কদর ছিল।

টুকরো কথা

নতুন নতুন নগর

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রধানত উত্তর ভারতে নগরায়ণ দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে এই আমলে প্রায় পুরো উপমহাদেশ জুড়ে নতুন নগর গড়ে ওঠে। তক্ষশিলার সিরকাপ-এ প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে একটি নগরের খোঁজ পেয়েছেন। তার থেকে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নগরগুলি বেশ উন্নত ছিল। কুষাণ আমলে গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে প্রাকার ঘেরা মথুরা ছিল বিখ্যাত নগর। ঐ নগরে কাদামাটির ইট ও পোড়ানো ইটের ব্যবহার দেখা যায়। এই সময় মথুরা খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। মথুরার ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্প ছিল বিখ্যাত।

মৌর্য আমলে প্রাচীন বাংলাতে মহাস্থানগড় ও বাণগড়ে নগর ছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে এইসময় তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি নগরও গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ওড়িশা এলাকার শিশুপালগড়ে নগরের খোঁজ পাওয়া গেছে। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতেও এই সময় নতুন নতুন নগর গড়ে ওঠে। কাবেরী নদীর বদ্বীপে কাবেরীপট্টিনম ছিল বিখ্যাত বন্দর-নগর।

এই আমলে বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম প্রথা ছিল কঠোর। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার থেকে অনেক গোষ্ঠী এই সময় ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। ধীরে ধীরে এদের অনেকেই ভারতীয় সমাজে মিশে যায়।

মৌর্য আমলের মতো এই সময়েও অবসর সময় কাটানোর নানান উপায় ছিল। নাচ, গান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। পাশাপাশি জাদুর খেলা ও নানান রকম দড়ির কসরত সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিত। পাশা খেলা, শিকার, রথের দৌড়, কুস্তি প্রভৃতি ছিল ধনী মানুষদের অবসর কাটানোর উপায়। বড়ো বড়ো উৎসবে সমস্ত মানুষের মধ্যে বিনা পয়সায় খাবার ও পানীয় বিলি করা হতো।

সমাজ জীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার। বাবা ছিলেন পরিবারের প্রধান। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে মায়ের নাম সন্তানের নামের সঙ্গে যুক্ত হতো। সাতবাহন শাসকদের অনেকের নামই তার প্রমাণ। কিন্তু, সমাজে নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের নীচে। পরিবারে মেয়ের বদলে ছেলে জন্মালে আনন্দ বেশি হতো। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে ছিল। অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কথা বলা হতো।

ছবি. ৭.২:

সাতবাহন আমলের মুদ্রা

টুকরো কথা

সাতবাহন আমলে দক্ষিণ ভারতের গ্রাম-জীবন

খ্রিস্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতক নাগাদ সাতবাহন-রাজা হাল একটি বই সংকলন করেন। প্রাকৃত ভাষায় লেখা ঐ বইটির নাম **গাথা সপ্তশতী** (সাতশোটি গাথার সংকলন)। এই বইতে সেই সময়ের দাক্ষিণাত্যের গ্রাম জীবনের নানান দিক সম্পর্কে জানা যায়। বইয়ের সমস্ত চরিত্রই গ্রামের সাধারণ মানুষ।

গ্রামবাসীরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। ধান, তেলের বীজ, কার্পাস ও শন ছিল প্রধান ফসল। গ্রামের বাড়িগুলি খড় দিয়ে ছাওয়া ও পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। পুকুর, ফুলের বাগান, ও বটগাছ সব গ্রামেই দেখা যেত। গ্রামে নানারকম গৃহপালিত পশু-পাখি ছিল।

গ্রামে চওড়া ও সরু— দু-রকম রাস্তাই ছিল। বর্ষায় রাস্তাগুলি কাদায় ভরে যেত। গ্রামের শাসন ছিল গ্রামণীর হাতে। চুরি-ডাকাতি থেকে টাকা পয়সা বাঁচাতে অনেকে সেগুলি মাটির নীচে পুঁতে রাখত। বিভিন্নরকম বাজনা ও ছবি আঁকার চল ছিল গ্রামগুলিতে। উৎসবের সময় গ্রামের লোকেরা নাচ, গান ও বাজনায় মেতে উঠত। সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার পুজো হতো মন্দিরে। গ্রামে বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রচলন ছিল।

৭.৪ আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত: গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমল

এই সময়কালেও কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ধান ছিল প্রধান ফসল। আখ, তুলো, নীল, সরষে ও তৈলবীজের চাষ হতো। দক্ষিণ ভারতে সুপুরি, নারকেল ও নানারকম মশলা চাষের কথা জানা যায়। সেসময় বিভিন্ন লেখায় জমির নানারকম ভাগ পাওয়া যায়। আবাদি জমিকে বাস্তুজমি ও অরণ্য থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হতো। এইসময় প্রাচীন বাংলায় জমির মাপ ও আয়তনের বিভিন্ন হিসেবের কথা জানা যায়।

গুপ্ত আমলে বাংলায় পাওয়া তাম্রলেখগুলিতে জমি কেনাবেচার কথা জানা যায়। বহু ক্ষেত্রে একটি জমি প্রথমে কেনা হতো। তারপরে ঐ জমি ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধবিহারকে দান করা হতো। ঐ দান করা জমিগুলি সাধারণত করের আওতায় পড়ত না। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এই জমিদানকে *অগ্রহার ব্যবস্থা* বলা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জমিতে ব্যক্তি মালিকানা আরো বেড়েছিল। দান পাওয়া জমিতে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো। ঐ জমির উৎপাদন থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খরচা চালাতেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরা। অনেক অনাবাদি জমিকে দান হিসেবে দেওয়া হতো। সেই জমিগুলিতে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো। তার ফলে সেগুলি আবাদি জমি হয়ে উঠত। অর্থাৎ অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে কৃষিকাজ বেড়েছিল।

এই সময়ে লোহার জিনিস তৈরির শিল্প খুব উন্নত ছিল। দিল্লির কুতুব মিনারের পাশে একটা লোহার স্তম্ভ আছে। সেটা খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে তৈরি। অথচ আজও সেটাতে মরচে পড়েনি। তাছাড়া এই আমলে লেখক বা করণিক ও চিকিৎসক পেশার কথা জানা যায়।

গুপ্ত আমলে দূরপাল্লার বৈদেশিক বাণিজ্যে খানিক ঘাটতি দেখা যায়। এর একটা কারণ ছিল হূণ আক্রমণ (এই বিষয়ে নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)। এর ফলে রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। তবে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে উপমহাদেশের বাণিজ্য জারি ছিল। পূর্ব উপকূলের তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি এই সময়ে আরো বাড়ে। তামিলনাড়ুর কাবেরীপট্টিনম বন্দরেও নিয়মিত দূরপাল্লার বাণিজ্য হতো।

টুকরো কথা

কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংঘ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই ব্যবসাবাণিজ্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি তৈরি হয়েছিল ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সংঘ। সংঘগুলি কারিগরি ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ মেটাত। তাছাড়া পেশাগত নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখত সংঘগুলি। জিনিসের গুণমান ও দাম ঠিক রাখাও সংঘের কাজের আওতায় পড়ত। সংঘগুলি **শ্রেণি**, **গণ** ইত্যাদি নামেও পরিচিত ছিল।

কুষাণ যুগে এক একটি পেশাকে কেন্দ্র করে আলাদা গ্রাম গড়ে উঠেছিল। শ্রেণি বা সংঘগুলি নিজস্ব আইন মোতাবেক চলত। তবে গুরুতর গোলমাল দেখা দিলে রাজা বা সম্রাটরা ব্যবস্থা নিতেন। শ্রেণি বা সংঘগুলি নিয়মিতভাবে

টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে কারিগর

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে নানা রকম কারিগরি শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। কারিগররা অনেক সময় একেকটা অঞ্চলে জমায়েত হয়ে বাস করতেন। কুষাণ আমলে কারিগরি শিল্পের বৈচিত্র্য বেড়েছিল। কুমোর, কামার, ছুতোর ও তাঁতির কথা জানা যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কারিগরও ছিল। যেমন, সোনার গয়না বানাত সুবর্ণকার। হাতির দাঁতের জিনিসপত্র বানাত দন্তকার। তাঁতিরা কাপড় বুনতো। কাপড় রং করত রঙ্গকার। পোশাকে সূচিশিল্পের কাজ করত সূচিকার।

নগদ অর্থের লেনদেন করত। সমাজের বিভিন্ন মানুষ সেখানে আমানত অর্থ জমা রাখত। নগদ অর্থ ছাড়াও জমি, গাছ ইত্যাদি স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা হতো। সেই জমা আমানতের উপর সুদও দেওয়া হতো। ঐ আমানত অর্থ বিভিন্ন শিল্পে মূলধন হিসেবে দেওয়া হতো। এইভাবে শ্রেণি বা সংঘগুলি এক ধরনের ব্যাংকের মতোই কাজ করত। নর্মদা নদীর উত্তরের হিরের খনি নিয়ে কুষাণ, সাতবাহন এবং শক-ক্ষত্রপদের মধ্যে লড়াই চলেছিল।

গুপ্ত ও তার পরবর্তী আমলে সংঘগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বেড়েছিল। শ্রেণির কাজকর্মের তদারকির জন্য বেশকিছু কর্মচারী বহাল করার তথ্য পাওয়া যায়। নগরের নানা শাসনকাজেও ধনী বণিকদের ভূমিকা বাড়তে থাকে। এই আমলে বণিকরাও কারিগরদের মতো সংঘ বানাতে শুরু করেন। বণিকদের নিজস্ব সংগঠনকে **বণিকগ্রাম** বলা হতো।

গুপ্ত আমলে অনেক সোনার ও রুপোর মুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্ত রাজাদের চালু করা সোনার মুদ্রাকে *দীনার* ও *সুবর্ণ* বলা হতো। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে রুপোর মুদ্রা প্রথম চালু করা হয়। তার নাম ছিল *রূপক*। সোনার ও রুপোর মুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে বেশি ব্যবহার হতো। রোজকার কাজেকর্মে ব্যবহারের জন্য তামার মুদ্রাও চালু করেন গুপ্ত শাসকরা। তবে গুপ্তদের সময়েই দক্ষিণের বাকাটক শাসকরা কোনো মুদ্রা চালু করেননি। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের সব জায়গায় মুদ্রার লেনদেন সমান ছিল না। তাছাড়া সমাজে কৃষিকাজ বাড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের হার কমেছিল। এই সবের ফলে নগরগুলিও আগের থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমাজে বর্ণাশ্রম চালু ছিল। তবে সবাই কঠোরভাবে সেসব মানত না। কিন্তু নীচুতলার মানুষদের প্রতি ব্রাহ্মণদের মনোভাব বিশেষ বদলায়নি। একই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের আলাদা শাস্তি হতো। ধার করলে শূদ্রকে অনেক চড়া হারে সুদ দিতে হতো। তবে এই আমলে শূদ্ররা কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য করতে পারত। অবশ্য সবথেকে খারাপ অবস্থা ছিল চণ্ডালদের। তারা গ্রাম বা নগরের মধ্যে থাকতেও পারত না। এমনকি ব্রাহ্মণরা তাদের ছোঁয়াছুয়ি এড়িয়ে চলত।

এই আমলেও পরিবারের প্রধান ছিলেন বাবা। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতি চালু ছিল। এই সময়ে অবশ্য মেয়েরা বিয়ের সময় কিছু সম্পদ পেতেন। ঐ সম্পদের উপরে কেবল ঐ মেয়েরই অধিকার ছিল। একে *স্ত্রীধন* বলা হতো। মেয়েরা নিজের ইচ্ছামতো ঐ সম্পদের ব্যবহার করতেন । তবে স্ত্রীধন প্রথা সমস্ত বর্ণের মধ্যে চালু ছিল না।

ছবি. ৭.৩:
গুপ্ত আমলের বিভিন্ন মুদ্রা। এর মধ্যে একটিতে সমুদ্রগুপ্তের বীণা বাজানোর ছাপ রয়েছে। সেটি কোনটি?

টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের খাবার-দাবার

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে চাল, গম, যব ও শাকসবজি ছিল প্রধান খাবার। ধনীদের মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রচলন বেশি ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজে দুধ ও দুধের তৈরি নানান রকম খাবারের ব্যবহার ছিল। গরিব মানুষেরা ঘিয়ের বদলে তেল ব্যবহার করত। তাছাড়া মটর, তিল, মধু, গুড়, নুন প্রভৃতি খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে নিরামিষ খাওয়া-দাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এমনকি সবরকম মাছ খাওয়ার উপরেও বিধিনিষেধ ছিল। দুধ ও নানান রকম ফলের রস থেকে তৈরি পানীয়ের ব্যবহার ছিল।

টুকরো কথা

ফাসিয়ান-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ফাসিয়ান চিন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখায় উপমহাদেশের মানুষ ও সমাজ বিষয়ে নানান কথা পাওয়া যায়। তবে তাঁর লেখায় কোথাও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা বলেননি তিনি।

ফাসিয়ান লিখেছেন, উপমহাদেশে অনেকগুলি নগর ছিল। মধ্য দেশের নগরগুলি ছিল উন্নত। সেখানে জনগণ সুখে বাস করত। তবে চণ্ডালরা নগরের বাইরে থাকত বলে তিনি জানিয়েছেন। যারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাদেরকেই **চণ্ডাল** বলা হতো। এদেশের লোকেরা অতিথিদের যত্ন করত। বিদেশিদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তার দিকেও তারা খেয়াল রাখত। পাটলিপুত্র ছিল দেশের সেরা নগর। সেখানকার লোকেরা ছিল সুখী ও সম্পদশালী। ধনী বৈশ্যরা নগরের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন। বিনামূল্যে সেখান থেকে ওষুধ দেওয়া হতো। গরিবদের খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা সেখানে ছিল।

সুয়ান জাং-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

সুয়ান জাং-এর লেখায় ভারতবর্ষ **ইন-তু** নামে পরিচিত হয়েছে। তাঁর মতে ইন-তু-র লোকেরা নিজেদের দেশকে বিভিন্ন নামে ডাকে। দেশটির পাঁচটি ভাগ — উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য। ইন-তু-তে আশিটি রাজ্য আছে। প্রতিটি রাজ্যে নিজস্ব রাজা থাকলেও তারা বড়ো সম্রাটের অনুগত ছিল।

সুয়ান জাং ইন-তুকে মূলত গরমের দেশ বলেছেন। সেখানে নিয়মিত বৃষ্টি হয়। উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। দক্ষিণ অঞ্চল বনে ঢাকা। পশ্চিম অঞ্চলের মাটি পাথুরে ও অনুর্বর। ধান ও গম প্রধান কৃষিজ ফসল। জনগণের মধ্যে জাতিভেদ ছিল।

শহরের বাড়িগুলি ইট ও টালি দিয়ে তৈরি হতো। বাড়ির বারান্দা তৈরি করা হতো কাঠ দিয়ে। গ্রামের বাড়িগুলির দেয়াল ও মেঝে ছিল মাটির। নানান রকম দামি ধাতু ও পাথরের ব্যাবসা চলত। শাসকরা জনগণের সুযোগ সুবিধের কথা মাথায় রাখতেন।

???

ভেবে দেখো

তোমরা সে আমলের খাবারের একটা তালিকা তৈরি করো। পাশাপাশি তোমরা এখন যেসব খাবার খাও তারও একটা তালিকা বানাও। সেই তালিকা দুটির তুলনা করো।

ভেবে দেখো   খুঁজে দেখো

১। **নীচের বিবৃতিগুলির সঙ্গে কোন ব্যাখ্যাটি সবথেকে বেশি মানানসই বেছে বের করো :**

১.১) বিবৃতি: মৌর্য-পরবর্তীযুগে অনেকগুলি গিল্ড গড়ে উঠেছিল।

ব্যাখ্যা : ১- রাজারা ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ানোর জন্য গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ২- কারিগর ও ব্যবসায়ীরা গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ৩- সাধারণ মানুষ টাকা লেনদেন ও গচ্ছিত রাখার জন্য গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

১.২) বিবৃতি: দাক্ষিণাত্যে ভালো তুলোর চাষ হতো।

ব্যাখ্যা : ১- দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি তুলো চাষের পক্ষে ভালো ছিল।

ব্যাখ্যা : ২- দাক্ষিণাত্যের সমস্ত কৃষক শুধু তুলোর চাষ করতেন।

ব্যাখ্যা : ৩- দাক্ষিণাত্যের মাটিতে অন্য কোনো ফসল হতো না।

২। **সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

২.১) জনপদ হলো ———— (কৃষিভিত্তিক/শিল্পভিত্তিক/শ্রমিকভিত্তিক) গ্রামীণ এলাকা।

২.২) মৌর্য আমলে অর্থনীতি মূলত ——— (শিল্পের/কৃষির/ব্যবসাবাণিজ্যের) উপরে নির্ভর করত।

২.৩) গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমিদানকে বলা হয় ——— (সামন্ত/বেগার/অগ্রহার) ব্যবস্থা।

৩। **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :**

৩.১) প্রথম নগরায়ণ (হরপ্পা) এবং দ্বিতীয় নগরায়ণ (মহাজনপদ)-এর মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে?

৩.২) প্রাচীন ভারতে জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কেন? সেযুগের জলসেচ ব্যবস্থার সঙ্গে আজকের দিনের জলসেচ ব্যবস্থার কোন পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে কি?

৩.৩) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে কৃষির পদ্ধতি ও উৎপাদিত ফসলের মধ্যে কী কী তফাৎ দেখা যায়?

৪। **হাতেকলমে করো :**

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ে কোন কোন পেশার মানুষদের কথা তুমি জানতে পারলে, তার তালিকা তৈরি করো। তার মধ্যে কোন কোন পেশা আজও দেখা যায়? বৈদিক সমাজে চালু জীবিকাগুলির সঙ্গে এইসময়ের পেশাগুলির কী কী মিল-অমিল দেখা যায়?

৮

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক

শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প

স্যার বললেন, তোমরাতো সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছ । দেখেছো যে, শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাতেই মানুষ খুশি ছিল না। নানা কিছু তৈরি করে চারপাশকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করল তারা। গুছিয়ে ভালো ভাষায় নিজের ও অন্যের কথা লিখল। এভাবেই শিল্প, সাহিত্যের শুরু হলো। তার পাশাপাশি চারপাশের নানা কিছু নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হলো তাদের মনে । সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শুরু হলো বিজ্ঞানচর্চার। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশেও সেভাবেই শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা শুরু হলো। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা নিয়ে আলোচনা করা যাক।
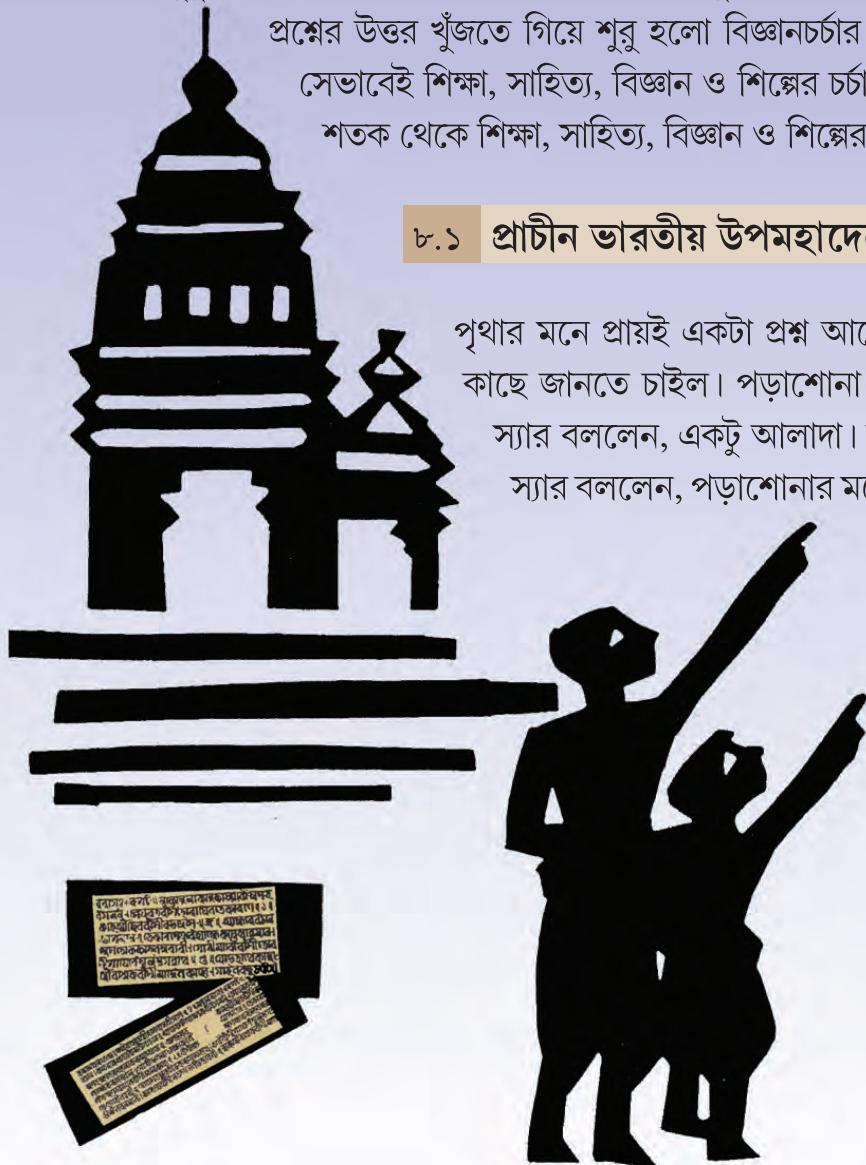
৮.১ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাচর্চা

পৃথার মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন আসে। আজ ক্লাসে ও সেটা স্যারের কাছে জানতে চাইল। পড়াশোনা আর লেখাপড়া কি একই স্যার? স্যার বললেন, একটু আলাদা। আব্বাস বলল, কীরকম আলাদা? স্যার বললেন, পড়াশোনার মধ্যে পড়া আর শোনার কথা আছে।

কিন্তু লেখার কথা নেই। অন্যদিকে লেখাপড়ার মধ্যে লেখা আর পড়ার কথা আছে। আজকাল তোমরা পড়া, শোনা ও লেখা তিনটেই করতে পারো। কিন্তু ধরো, যখন লেখার চল ছিল না, তখনতো শুনে শুনেই মনে রাখতে হতো। হরপ্পায় লিপি ছিল, কিন্তু সাহিত্য ছিল কিনা জানা যায় না। অরুণ বলল, জানি স্যার, হরপ্পার লিপি আমরা এখনো পড়ে উঠতে পারিনি। সেলিম বলল, স্যার অনেকদিন আগে পড়াশোনা ও লেখাপড়া তাহলে কেমনভাবে হতো?

পরবর্তী বৈদিক যুগের পড়াশোনার প্রথা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদও প্রচলিত ছিল। তবে তার পাশাপাশি বৌদ্ধবিহারগুলিতে এক নতুন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন ধরনের লিপির ব্যবহার শুরু হয়। ফলে মৌখিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন লিপিগুলিও ছাত্রদের শিখতে হতো। বৈদিক শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত। অর্থাৎ গুরু শিষ্য সম্পর্ক-কেন্দ্রিক। তাকে *গুরুকুল ব্যবস্থা* বলা হতো। অন্যদিকে বৌদ্ধরা লেখাপড়া শিখত *বিহার* বা *সংঘে*। ছাত্রদের সেখানে থেকে পড়তে হতো। নতুন কতগুলি বিষয় এই সময় পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত হয়। কৃষি, চিকিৎসা, রাজ্য শাসন প্রভৃতি বিষয়ও পড়তে হতো। এই সময় *আশ্রম* নামে শিক্ষাকেন্দ্রের বিকাশ ঘটে। সেখানে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতো।

বৌদ্ধবিহারগুলিতে ধর্মীয় বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও পড়াশোনা হতো। সেখানে তির ও তরবারি চালানো, কুস্তি ও নানাধরনের খেলাধুলো শেখানো হতো। শ্রমণ ও ভিক্ষুদের সুতোকাটা, কাপড় বোনা শিখতে হতো। বিহারগুলিতে ছাত্রদের থাকার জন্যে আলাদা ঘর থাকত। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা যাচাই করেই নেওয়া হতো। পড়াশোনার জন্য বেতন দিতে হতো। গরিব ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৃত্তি দেওয়া হতো।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক নাগাদ বিভিন্ন বিষয়ের পড়াশোনার কথা জানা যায়। বেদের পাশাপাশি ছন্দ, কাব্য, ব্যাকরণ পড়ানো হতো। তার সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন প্রভৃতিও পড়তে হতো। তবে মূলত ব্রাহ্মণরাই ঐ বিষয়গুলি চর্চা করতেন। ক্ষত্রিয়দের রোজকার শাসন চালানোর জন্য কিছু বিষয় পড়তে হতো। যেমন, যুদ্ধ ও শিকার, মুদ্রা ও নথিপত্র পরীক্ষা। বৈশ্য ও শূদ্রদের ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে পড়াশোনা করতে হতো। এর থেকে বোঝা যায় জীবিকার সঙ্গে পড়াশোনার একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এই সময় থেকেই কারিগরি বিষয়ে পড়াশোনার কথা বেশি করে জানা যায়। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুর ভূমিকাই ছিল প্রধান। অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ছাত্ররা কোনো দক্ষ কারিগরের কাছে যেতেন। কারিগর-গুরুর বাড়িতেই ছাত্ররা থাকত। তাঁর কর্মশালাতেই কাজ শিখত। কাজ শেখার শেষে অনেকেই গুরুর কর্মশালাতেই কাজ করত। কেউ কেউ গুরুর অনুমতি নিয়ে নিজের আলাদা কর্মশালা তৈরি করত।

গুপ্তযুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তবে গুরুর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার পুরোনো পদ্ধতিরও চল ছিল। এই সময় বিভিন্ন রাজারা বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে লিপি ও ভাষা এবং বৈদিক সাহিত্য ছিল প্রধান। পাশাপাশি কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ,

নাটক, আইন, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যাও পড়ানো হতো। পেশাভিত্তিক শিক্ষার ওপরেও এ সময়ে জোর দেওয়া হয়।

কিছু কিছু বৌদ্ধবিহারকে মহাবিহার বলা হতো। দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন ছাত্র ঐ মহাবিহারগুলিতে পড়তে আসত। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীল ও বলভী মহাবিহারগুলি খুবই বিখ্যাত ছিল। রাজারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জমি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র, কনৌজ, উজ্জয়িনী, মিথিলা, তাঞ্জোর, কল্যাণ প্রভৃতি নগরে।

নালন্দা মহাবিহারে যে-কোনো ধর্ম ও বর্ণের ছাত্ররা পড়তে পারত। তবে তাদের কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে সেখানে ভর্তি হতে হতো। সেখানে থাকা, খাওয়া ও পড়ার জন্য কোনো খরচ লাগত না। লেখাপড়া শেষ হবার পর নালন্দাতে রীতিমতো পরীক্ষা দিতে হতো। চিন, তিব্বত, কোরিয়া, সুমাত্রা, জাভা থেকে ছাত্ররা নালন্দায় পড়তে আসত। নালন্দাতে সেই সময়ের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত পড়াতেন।

টুকরো কথা
তক্ষশিলা মহাবিহার

গন্ধার মহাজনপদের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। গ্রিক, পারসিক, কুষাণ, শক নানা বিদেশি শক্তি নানা সময়ে তক্ষশিলা দখল করে। ফলে সেখানে নানা দেশের মানুষ ও পণ্ডিত লোকের আনাগোনা ছিল। বৌদ্ধধর্ম তক্ষশিলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা তক্ষশিলায় যেত উচ্চশিক্ষার জন্য। ষোলো থেকে কুড়ি বছর বয়সের ছাত্ররা সেখানে ভর্তি হতে পারত। ধর্ম বা বর্ণ নয় বরং যোগ্যতা যাচাই করেই ছাত্রদের নেওয়া হতো। মোটামুটি আটবছর তারা সেখানে লেখাপড়া করত। রাজা ও ব্যবসায়ীরা এই মহাবিহার চালানোর জন্য টাকাপয়সা বা জমি দান করতেন।

এখানে পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল বেশ সহজ। মনে হয় লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তবে লেখাপড়ার মান ছিল বেশ ভালো। এই মহাবিহারের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন জীবক, পাণিনি এবং চাণক্য।

গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে অনেকটা আজকের দিনের হাতেখড়ির মতো একটি অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। তার নাম *বিদ্যারম্ভ* (বিদ্যা + আরম্ভ)। পাঁচ বছর বয়সে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই অক্ষর পরিচয় হতো। এই পর্যায়ে ছাত্রকে একটি পাঠ্য বই ও গণিত পড়ানো হতো।

টুকরো কথা
প্রাচীন ভারতের শিক্ষক

আচার্য ও উপাধ্যায় ছিলেন প্রাচীন ভারতের বৈদিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত দু-ধরনের শিক্ষক। আচার্যের বাড়িতেই ছাত্ররা থাকত ও খেত। আচার্যরা বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়াতেন। এর বিনিময়ে ছাত্র আচার্যকে নানা কাজে সহায়তা করত। নারীরাও আচার্য হতে পারতেন। তাঁদের বলা হতো **আচার্যা**।

উপাধ্যায়রা এক একটি নির্দিষ্ট বিষয় পড়াতেন। পড়ানোর বিনিময়ে তাঁরা বেতন নিতেন। নারী উপাধ্যায়কে বলা হতো **উপাধ্যায়া**। বৌদ্ধ শিক্ষায় উপাধ্যায়দের গুরুত্ব ছিল বেশি। তাঁরা বৌদ্ধ বিহারগুলিতে থেকেই পড়াতেন। বৌদ্ধ ছাত্রদের বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘের নিয়ম মেনে চলার শপথ করতে হতো।

৮.২ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য চর্চা

ভাষার ব্যবহার হয় কথা বলতে গিয়ে। আবার লিখতে গিয়েও ভাষা লাগে। তবে মুখের ভাষা আর লেখার ভাষায় অনেক তফাত থাকে। মুখের ভাষায় থাকে আঞ্চলিক টান। কিন্তু লিখতে গিয়ে সেসব ব্যবহার করা হয় না। তখন সবাই যাতে পড়ে বুঝতে পারে তেমন ভাষাতেই লেখা হয়। প্রাচীন ভারতেও মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা আলাদা ছিল। ঋকবেদের ভাষা ছন্দস্ বা ছান্দস্ ছিল বলে মনে করা হয়। সেই ভাষাতেই সবাই কথা বলত। কিন্তু ধীরে ধীরে ভাষায় নানা অঞ্চলের টান মিশে যেতে শুরু করে। তাতে নানা অঞ্চলের ভাষা তৈরি হতে থাকে। তাই ভাষা ও তার ব্যবহারকে নিয়মে বাঁধা দরকার। সেই নিয়ম থেকেই তৈরি হয় ব্যাকরণ। পাণিনি নামের এক পণ্ডিত তেমনই একটা ব্যাকরণ লিখলেন। তার নাম *অষ্টাধ্যায়ী*। সেখানে পাণিনি ভাষার নানান নিয়ম তৈরি করলেন। তার ফলে ভাষার সংস্কার হলো। সংস্কার হয়ে যে ভাষাটা তৈরি হলো তারই নাম *সংস্কৃত*।

বিভিন্ন অঞ্চলে একই ভাষা নানাভাবে উচ্চারণ হতে শুরু হয়। সেই ভাষাগুলোকে *প্রাকৃত* বলা হতো। প্রকৃত বা আসল থেকে প্রাকৃত কথাটা এসেছে। ফলে পাণিনির সংস্কার করা ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষা আলাদা। অন্যদিকে ছন্দস্ থেকে ভেঙে ভেঙে তৈরি হলো পালি ভাষা। প্রাকৃত ও পালি ভাষাগুলি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হলো। তবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় লেখালেখি শুরু হয়। জৈন (প্রাকৃত) ও বৌদ্ধ (পালি) ধর্মের সাহিত্য লেখা হলো ঐ ভাষাগুলিতেই।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্যবসাবাণিজ্য বাড়তে থাকে। ফলে সমাজে বৈশ্যদের মর্যাদা বেড়ে যায়। নতুন তৈরি হওয়া নগরগুলোয় জাতি ও বর্ণের কড়াকড়ি কমতে থাকে। তাই পুরোনো জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে সংস্কৃত ভাষায় *ধর্মশাস্ত্র* লেখার চল শুরু হয়। ব্রাহ্মণরাই যে শ্রেষ্ঠ, সে কথাটাই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নানাভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হতো। এর পাশাপাশি *স্মৃতিশাস্ত্র* বলে এক ধরনের লেখালেখি শুরু হয়। সেগুলিতে সম্পত্তির অধিকার ও রোজকার জীবনের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করা হতো। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে রাজনীতি নিয়েও কিছু কথা থাকত। তবে ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি লেখার কাজ পরবর্তী সময়েও চলেছিল। তাছাড়া রাজনীতি বিষয়ে বই লেখার প্রচলন এই সময় হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে বিখ্যাত হলো *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*।

টুকরো কথা

মোগলমারি বৌদ্ধবিহার

ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং-এর লেখা থেকে জানা যায় বাংলায় অনেকগুলো বৌদ্ধ-বিহার ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন শহরের কাছে মোগল-মারিতে। প্রত্নতাত্ত্বিক ড. অশোক দত্ত ঐ বৌদ্ধ-বিহারটি আবিষ্কার করেন। এই বৌদ্ধ-বিহারটি নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সময়েরই। পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ-প্রত্নস্থলের মধ্যে এখনও এটি সবথেকে বড়ো। তবে এই বৌদ্ধবিহারটির নাম কী ছিল তা এখনো জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন, সুবর্ণরেখা নদী এই বিহারটির খুব কাছ দিয়ে বয়ে যেত। মগধ থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর যাওয়ার পথের মধ্যেই বিহারটির অবস্থান। তাই এই বিহারটিতে বণিকদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল মনে হয়।

ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হচ্ছিল। নদী ও সমুদ্র পারাপারের সময় গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে জানাবোঝার দরকার হতো। ফলে এই সময় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ও গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ের লেখালেখি দেখা যায়।

টুকরো কথা
রামায়ণ ও মহাভারত

রামকে নিয়ে লেখা হয়েছে যে প্রাচীন মহাকাব্য তাই **রামায়ণ**। রামায়ণের কবি হিসাবে বাল্মীকির নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে মোট চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে। পুরো মহাকাব্যটি সাতটি কাণ্ডে (ভাগ) ভাগ করা। এর মধ্যে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডটি সম্ভবত বাল্মীকির লেখা নয়। সে দুটি পরে রামায়ণে যোগ করা হয়েছিল।

রামায়ণের প্রধান চরিত্র রাম, সীতা ও রাবণ। রাম-রাবণের যুদ্ধকে ঘিরেই রামায়ণের মূল গল্প। অবশ্য পরবর্তী সময়ে রামায়ণের নানারকম অনুবাদ হয়েছিল। সেগুলোতে গল্পের মধ্যে বেশ কিছু বদলও দেখা যায়। ঠিক কবে মূল রামায়ণ রচনা হয় তা বলা মুশকিল। তবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের আগেই রামায়ণ রচনা হয় বলে মনে হয়। কারণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ পালি সাহিত্যে রামায়ণের গল্প দেখা যায়।

মহাভারত মহাকাব্য আসলে ভরত গোষ্ঠীর জীবন ও কাজকর্মের গল্প। মহাভারতে আদিতে আট হাজার আটশো শ্লোক ছিল। বলা হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের কথা নিয়েই মহাভারত রচনা করেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হয়েছিল। মহাভারতের আদিনাম ছিল **জয়কাব্য**। বৈশম্পায়ন তাতে আরো শ্লোক যোগ করে তার নাম দেন **ভারত**। সৌতি পরে আরো শ্লোক জুড়ে **মহাভারত** নাম রাখেন। অর্থাৎ মহাভারত কোনো একজনের রচনা নয়।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে মহাভারতের কথা বিশেষ জানা যায় না। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে মহাভারত সংকলন হয়েছিল। মহাভারতের চর্চা করলে বেদচর্চার মতোই সুফল হবে বলা হতো। তাই মহাভারতকে **পঞ্চমবেদ** বলা হয়েছে।

মহাভারতের মূল বিষয় কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ। তার পাশাপাশি ভূগোল, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিষয়েও অনেক আলোচনা রয়েছে। পুরো মহাভারত আঠারোটি সর্গ বা ভাগে ভাগ করা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক নাগাদ মহাকাব্য দুটি আজকের চেহারা পায়।

টুকরো কথা
প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের লিপি

ভাষা যখন লিখতে হয় তখন লাগে বর্ণ বা লিপি। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে দু-রকমের লিপির চল ছিল। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক থেকে বাঁদিকে লেখা হতো। ব্রাহ্মী লেখা হতো বাঁদিক থেকে ডান দিকে। উত্তর ভারতে ব্রাহ্মী লিপি থেকেই ধীরে ধীরে দেবনাগরী লিপি তৈরি হয়। ধর্মীয় কাজে বা দেবতার কাজে নগরের ব্রাহ্মণরা ঐ লিপির ব্যবহার করতেন। তাই তার নাম দেবনাগরী। ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার খুব বেশি ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালেখ-গুলিতে বেশিরভাগ ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগেই ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই লিপির নানা বদল ঘটেছিল।

সংস্কৃত ব্যাকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন অভিধান লেখার কথা জানা যায়। নাটক ও অভিনয় ছিল উঁচুতলার মানুষের বিনোদনের মাধ্যম। ফলে নাটক ও অভিনয় বিষয়ে বিভিন্ন লেখালেখি শুরু হয়েছিল। যেমন, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-র কথা বলা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় নানা রকমের সাহিত্য লেখা হয়েছিল। তখন আস্তে আস্তে সংস্কৃত ভাষা রাজদরবারে গুরুত্ব পাচ্ছিল। এই সময়ে পতঞ্জলি *মহাভাষ্য* নামে সংস্কৃতে ব্যাকরণ বই লেখেন। এই পর্যায়ের দুজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন অশ্বঘোষ এবং ভাস। পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধের কাহিনি লেখা হয়েছিল।

জৈনরা অর্ধ-মাগধী ও প্রাকৃত দুই ভাষাতেই সাহিত্য লিখত। এই সময়ে বেশির ভাগ লেখমালা প্রাকৃত ভাষায় লেখা। সাধারণত শাসনকাজ চালানো হতো প্রাকৃত ভাষাতেই। সাতবাহন-রাজা হালের লেখা *গাহা-সত্তসঈ* বা *গাথা সপ্তশতী* প্রাকৃত ভাষার একটি বিখ্যাত কবিতা সংকলন।

দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় সাহিত্য লেখার প্রচলন এই সময়েই শুরু হয়। জানা যায় যে, মাদুরাই নগরীতে তিনটি সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলনগুলি *সঙ্গম* নামে পরিচিত। সঙ্গম মানে এক জায়গায় জড়ো হওয়া। তাই তামিল সাহিত্যকে *সঙ্গম সাহিত্য* বলা হয়। প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যের অন্যতম সেরা উদাহরণ একটি কবিতা সংকলন। সেই কবিতাগুলিতে অনেক সাধারণ মানুষের কথা পাওয়া যায়। কৃষকের জীবন, গ্রামের ছবি ও নগরের নানা কথা ঐ কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। তামিল ভাষার ব্যাকরণ চর্চাও এই সময় শুরু হয়েছিল।

চিকিৎসার নানা দিক নিয়েও গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের লেখায় নানারকম ওষুধ ও অস্ত্রোপচারের কথা পাওয়া যায়। *চরক-সংহিতা* ও *শুশ্রুত-সংহিতা* চিকিৎসা নিয়ে লেখা দুটি বিখ্যাত বই। সেই সময় সমাজে চিকিৎসার গুরুত্ব এতটাই ছিল যে, চিকিৎসা শাস্ত্রকে *উপবেদ* বলা হতো। তাছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও বই লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬৫০ অব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। তবে এই সময়ে সাহিত্য যাঁরা লিখতেন ও যাঁরা পড়তেন তারা সবাই উঁচুতলার মানুষ ছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি ঐ লেখাগুলি থেকে বিশেষ পাওয়া যায় না। সম্রাট ও রাজাদের দরবারে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা হতো। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই পুরো সময়কালে মহিলা সাহিত্যিকের কথা জানা যায় না।

টুকরো কথা

পুরাণ

পুরাণ শব্দটির একটি অর্থ পুরোনো। পুরাণে সেই পুরোনো দিনের কথাই থাকে। পুরাণ সংখ্যায় আঠারোটি। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের আগেই কয়েকটি পুরাণ রচিত হয়েছিল। বাকি পুরাণগুলি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে রচনা করা হয়।

রাজবংশগুলির ইতিহাস পুরাণের একটি প্রধান আলোচনার বিষয়। তাছাড়া কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতির কথাও পুরাণে রয়েছে। পুরাণ- গুলির সঙ্গে অনেক সময়েই ইতিহাস শব্দটিও যুক্ত রয়েছে। প্রাচীন ভারতে পুরাণ ও ইতিহাসের তফাত নির্দিষ্ট ছিল না। ফলে পুরাণ হলো এমন গল্পকথা যাতে কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদানও মিশে রয়েছে।

মূর্তি, চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের বিষয়েও সংস্কৃতে বই লেখা হয়েছিল। কিন্তু কারিগরি শিল্পের উপরে আলোচনা কোনো বইতে দেখা যায় না। গুপ্তযুগেও নাটক, অভিধান ও বিজ্ঞান বিষয়ে নানান লেখাপত্রের কথা জানা যায়। কবি এবং নাট্যকার কালিদাস ছিলেন এই সময়ের সবথেকে বিখ্যাত সাহিত্যিক। শূদ্রক, বিশাখদত্ত এবং ভারবি প্রমুখও ছিলেন এই পর্যায়ের বিখ্যাত লেখক।

টুকরো কথা
শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম

শূদ্রকের **মৃচ্ছকটিকম** প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিখ্যাত নাটক। মৃচ্ছকটিকম কথাটির মানে হলো **মাটির তৈরি ছোটো গাড়ি**। **মৃৎ** মানে মাটি আর **শকটিকা** মানে ছোটো শকট বা গাড়ি। এই দুয়ে মিলে মৃচ্ছকটিকম। এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র চারুদত্ত। তার ছেলে ছোট্ট রোহসেন প্রতিবেশী বণিকের ছেলের সোনার তৈরি খেলনাগাড়ি দেখে। ঐ রকম একটি খেলনাগাড়ির জন্য বায়না ধরে রোহসেন। তখন তাকে ভোলানোর জন্য একটা মাটির খেলনাগাড়ি দেওয়া হয়। কিন্তু রোহসেনের বায়না ও কান্না তাতে থামে না। এই নাটকের আরেক প্রধান চরিত্র বসন্তসেনা। রোহসেনের কান্না দেখে সে কষ্ট পায়। রোহসেনের খেলনাগাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য বসন্তসেনা নিজের সোনার গয়না দিয়ে দেয়। এই নাটকের চরিত্রগুলি সব সাধারণ মানুষ। তাদের জীবনের সুখ-দুঃখই নাটকটিতে ফুটে উঠেছে।

বিশাখদত্তের লেখা দুটি নাটক খুব বিখ্যাত। *মুদ্রারাক্ষস* ও *দেবীচন্দ্রগুপ্তম*। নন্দরাজা ধননন্দকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন দখলই মুদ্রারাক্ষসের বিষয়বস্তু। গুপ্তবংশের রাজা রামগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শকরাজার যুদ্ধকে নিয়ে লেখা হয়েছিল *দেবীচন্দ্রগুপ্তম* নাটক। এর থেকে বোঝা যায় সেকালে ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও সাহিত্য লেখা হতো।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য লেখার প্রচলন দেখা যায়। তবে সেই গদ্যগুলি পালি ভাষায় লেখা গদ্যের মতো সরল ছিল না। দণ্ডীর লেখা *দশকুমার চরিত* সংস্কৃত গদ্যে লেখা একটি বিখ্যাত বই। ভর্তৃহরি ছিলেন এই সময়ের বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক। অমরসিংহের সংকলন করা *অমরকোষ* এই সময়ের একটি বিখ্যাত অভিধান। সম্রাট ও রাজারাও লেখালেখির চর্চা করতেন। জানা যায় যে, রাজা হর্ষবর্ধন নিজেও তিনটি নাটক লিখেছিলেন। সেগুলি হলো *নাগানন্দ*, *রত্নাবলী* ও *প্রিয়দর্শিকা*।

টুকরো কথা
অশ্বঘোষ ও ভাস

সাধারণভাবে মনে করা হয় অশ্বঘোষ কনিষ্কের সময়ের সাহিত্যিক ছিলেন। নিজের রচনায় নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি অশ্বঘোষ। কেবল এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর বিখ্যাত রচনা হলো **বুদ্ধচরিত কাব্য**। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বক্তব্যই বুদ্ধচরিত কাব্যের মধ্যে ধরা আছে।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের নাট্যকার ছিলেন ভাস। তাঁর কয়েকটি নাটক মহাভারত ও রামায়ণের বিষয় নিয়ে লেখা।

চিকিৎসা বিষয়েও বই লেখা গুপ্তযুগে চালু ছিল। বাগভট্ ছিলেন এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। পশু চিকিৎসা নিয়েও কয়েকটি বই লেখা হয়েছিল। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই গুপ্তযুগে লেখা হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ তামিল অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিশেষভাবে খেয়াল করা যায়। এর ফলে তামিল ভাষাতেও সংস্কৃতের মতো দীর্ঘ কবিতা লেখার চল শুরু হয়। ঐ দীর্ঘ কবিতাগুলিকে তামিল সাহিত্যে মহাকাব্য বলা হতো। এমনি দুটি মহাকাব্য ছিল *শিলপ্পাদিকারম* ও *মণিমেখলাই*। তামিল কবিরা রামায়ণেরও নানান অনুবাদ করেছিলেন। কম্বনের রামায়ণের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। তবে কম্বন তাঁর রামায়ণে অনেক নতুন গল্প যোগ করেছিলেন। সেখানে রামের থেকে রাবণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

টুকরো কথা
সাহিত্যে নীতিশিক্ষা

ঠিক-ভুল বিচার শেখানোর জন্য পুরোনো আমলে একধরনের বই লেখা হতো। সেই বইগুলিতে মানুষ ও বিভিন্ন পশুপাখির চরিত্র থাকত। তাদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই গল্পগুলো তৈরি হতো। বিভিন্ন ঘটনায় কেমন আচরণ করা উচিত, সেটাই গল্পগুলোর মূল কথা হতো। তাই এইধরনের গল্পের বইগুলিকে নীতিশিক্ষার সংকলন বলা যেতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা **পঞ্চতন্ত্র** তেমনই একটি নীতিগল্পের সংকলন। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক নাগাদ এর গল্পগুলি সংকলন করা হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের মূল রচনাটি পাওয়া যায়নি। জানা যায় যে, একজন রাজা তাঁর ছেলেদের বোকামিতে দুঃখ পেয়েছিলেন। তখন পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার কাছে ছেলেদেরকে পাঠান পড়াশোনার জন্য। বিষ্ণুশর্মা বিভিন্ন নীতিগল্পের মধ্যে দিয়ে ছয়মাসেই রাজার ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আদতে গল্পগুলো ছোটোদের জন্য লেখা হয়েছিল। তবে সেগুলির ভেতরে সবার জন্যই নানান বক্তব্য রয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের মতোই বিভিন্ন গল্পসংকলনে নীতিশিক্ষা দেওয়া হতো। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও এধরনের নীতিশিক্ষামূলক রচনার চল ছিল। বৌদ্ধজাতকগুলি এর বড়ো উদাহরণ। তামিল সাহিত্যেও নীতিশিক্ষার কথা পাওয়া যায়।

টুকরো কথা
কালিদাস

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন কালিদাস। তবে তিনি কোন সময়ের মানুষ ছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মোটামুটিভাবে মনে করা হয় তিনি গুপ্তযুগের সাহিত্যিক ছিলেন। কালিদাসের জীবন নিয়ে অনেক গল্পকথাও প্রচলিত রয়েছে। কাব্য ও নাটক — দুই-ই লিখেছেন কালিদাস। **মেঘদূতম**, **কুমারসম্ভবম** তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত কাব্য। **অভিজ্ঞান শকুন্তলম**, **মালবিকাগ্নিমিত্রম** প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত নাটক। তাঁর রচনায় সেই সময়ের সমাজ ও প্রকৃতির নানাদিক ফুটে উঠেছে।
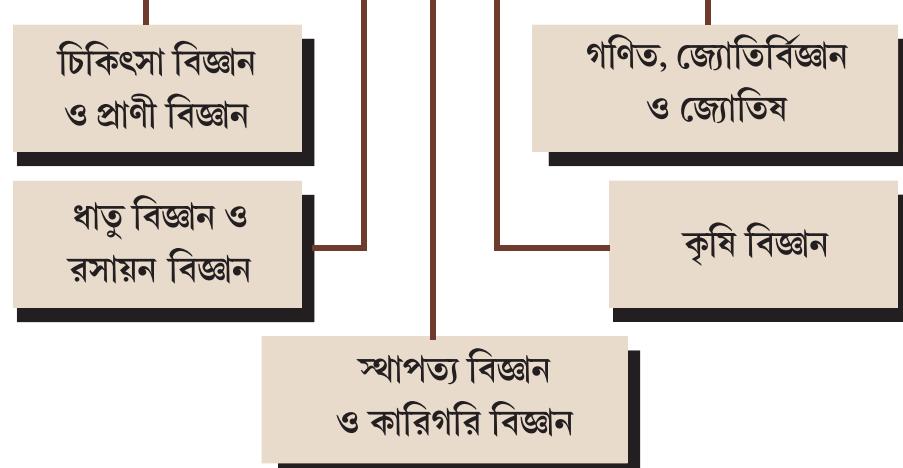
৮.৩ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চা

বিজ্ঞান কথার মানে কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করা। *প্রযুক্তি* কথার মানে প্রয়োগ করা। বিজ্ঞানের নানা কিছু জ্ঞান রোজকার জীবনে প্রয়োগ করা দরকার হয়। যেমন, বাড়ি বানাতে জ্যামিতির ধারণা প্রয়োগ করতে হয়। তাই বাড়ি বানাবার কাজটা প্রযুক্তির অংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ আছে। এক এক সমাজে এক এক রকম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দরকার হয়। ধরা যাক, একটা সমাজের মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানে না। ঐ সমাজে ধাতু বিজ্ঞান ও ধাতু প্রযুক্তির দরকার হবে না। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা ও বৈদিক সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ছিল। সেসব আলোচনা আগেই হয়েছে। এবারে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ থেকে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

টুকরো কথা

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

রামায়ণে একটা গল্প রয়েছে। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে শক্তিশেল অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বৈদ্য সুষেণ বলেছিলেন ক্ষতস্থানে **বিশল্যকরণী** লাগিয়ে দিলেই লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। বিশল্যকরণী একটি ঔষধি গাছ। ঔষধি খুঁজতে হনুমান গেলেন গন্ধমাদন পর্বতে। কিন্তু বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে পুরো পর্বতটাই তুলে নিয়ে এলেন হনুমান। বিশল্যকরণী লাগানোর ফলে লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠেলেন। বিশল্যকরণী কথার মানে বিশেষ রূপে শল্যকরণের পর (অস্ত্রোপচারের পর) যে ওষুধ লাগানো হয়। আদতে এটা গল্প হলেও, চিকিৎসার প্রসঙ্গটা জরুরি।

পরবর্তী বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন ঔষধ ও অস্ত্রোপচারের কথা রয়েছে। *চরক সংহিতায়* প্রায় সাতশো ঔষধি গাছপালার কথা পাওয়া যায়। এই বইতে রোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা আছে। একটি আদর্শ হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত তার বিবরণ চরক সংহিতায় পাওয়া যায়। হাড় ভেঙে গেলে, বা নাক, কান ইত্যাদি কেটে গেলে তা জোড়ার কাজে শল্য চিকিৎসকরা ছিলেন অত্যন্ত পটু। এই বিদ্যায় বিখ্যাত ছিলেন শুশ্রুত।

টুকরো কথা
জীবক

জীবক ছিলেন বুদ্ধের সময়কালের বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি ছিলেন বিম্বিসারের রাজবৈদ্য। তাঁর জন্ম রাজগৃহে হলেও, তিনি তক্ষশিলায় গিয়ে গুরু আত্রেয়র কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

শিক্ষা শেষ হবার পর গুরু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দেন আশেপাশের এলাকা থেকে ভেষজগুণহীন গাছপালা জোগাড় করে আনতে। নির্দিষ্ট সময়ের পর জীবক বাদে অন্য সবাই নমুনা জোগাড় করে ফিরে আসে। অনেক পরে জীবক খালি হাতে ফিরে এলে গুরু অবাক হন। এর কারণ জানতে চাইলে জীবক বলেন, ভেষজগুণহীন কোনো গাছ তার নজরে পড়েনি। এই উত্তরে গুরু খুশি হন। তিনি বুঝতে পারেন ভেষজ উদ্ভিদ বা ঔষধি সম্বন্ধে জীবকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। জীবক রাজা বিম্বিসার ও গৌতম বুদ্ধকে বেশ কয়েকবার কঠিন রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছিলেন।

জাতিভেদ প্রথা কঠোর হবার ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। বলা হতো আগের জন্মে পুণ্য করলে পরের জন্মে রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এধরনের কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিরোধী ছিল। রোগ সারাতে গেলে নানান রকম খাদ্যের কথা বলা ছিল। অথচ সেই খাদ্যের অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্রের মতে খাওয়া বারণ ছিল। ফলে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন সময় বিরোধ তৈরি হয়েছিল। *শুশ্রুত সংহিতায়* চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শবব্যবচ্ছেদ বা মড়াকাটা। অথচ ধর্মশাস্ত্রের মতে শব বা মৃতদেহ ছোঁয়া নিষেধ ছিল। ফলে মড়াকাটা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য শারীরবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসার চর্চা ধীরে ধীরে কমে গেল। বাগভট্‌-এর পর থেকে শল্যচিকিৎসার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ ছিল না। তাছাড়া চিকিৎসকরা রোগী ব্রাহ্মণ না শূদ্র তার বিচার করতেন না। ফলে প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথার সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার বিরোধিতা তৈরি হয়।

???

ভেবে দেখো

বৌদ্ধ মতে চরক প্রথম কনিষ্কের আমলের লোক ছিলেন। তাহলে চরক সংহিতা কি চরক নামে কোনো ব্যক্তির লেখা? চরক কথাটির মানে যারা ঘুরে বেড়ায়। বেদের একটি শাখায় চারণ-বৈদ্য বা ঘুরে বেড়ানো চিকিৎসকদের কথা পাওয়া যায়। তাহলে কী চরক সংহিতা ঐ রকম ঘুরে বেড়ানো চিকিৎসক-দের অভিজ্ঞতার সংকলন?

শুশ্রুত কোন সময়ের লোক ছিলেন তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। শুশ্রুত কথাটির মানে যিনি বা যাঁরা ভালো করে শুনেছিলেন। তাহলে শুশ্রুত সংহিতাও কি ঐরকম চারণ-বৈদ্যদের অভিজ্ঞতার সংকলন?

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষচর্চা দীর্ঘদিন একসঙ্গে চলেছিল। জৈন ও বৌদ্ধরাও গণিতের চর্চা করতেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থ থেকে সে বিষয়ে অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি মিলিয়ে বৌদ্ধদের গণিতবিজ্ঞান তৈরি হয়েছিল। জৈনরা তাকেই বলতেন *সংখ্যায়ন*। সেই সময়ে পড়াশোনায় গণিতের স্থান ছিল সামনের সারিতে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দুজনেই গণিতের চর্চা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন ছিলেন একজন গণিতবিদ।

গুপ্তযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের অনেক উন্নতি হয়েছিল। যদিও গুপ্ত যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেকটাই জ্যোতিষচর্চার কাজে ব্যবহার হতো। আর্যভট্ট গণিতকে একটি আলাদা চর্চার বিষয় করে তুলেছিলেন। *আর্যভটীয়* বইতে গণিত, সময় ও গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন আর্যভট্ট। সেই বইতে সংখ্যা হিসাবে শূন্যের ব্যবহার করেন তিনি। সেই চর্চা থেকেই দশমিকের ধারণাও শুরু হয়েছিল। আর্যভট্ট বলেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার ও নিজের অক্ষের উপর পৃথিবী ঘুরছে। তাঁর মতে, পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ার ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

আর্যভট্টের পরবর্তীকালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন বরাহমিহির। *সূর্যসিদ্ধান্ত* ও *পঞ্চসিদ্ধান্তিকা* বইতে বরাহমিহির পুরোনো ধারণার অনেক বদল করেছিলেন। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও তার আগাম লক্ষণ কী কী, তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। আবার ভূমিকম্পের আগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক লক্ষণ বিষয়ক আলোচনাও বরাহমিহিরের লেখায় পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর হাতেই প্রাচীন ভারতের গণিত সবথেকে বেশি বিকশিত হয়েছিল। *ব্রহ্মসিদ্ধান্ত* তাঁর একটি বিখ্যাত বই।

ছবি. ৮.১ :
মেহরৌলির লোহার স্তম্ভ

প্রাচীন ভারতে খনি ও ধাতু বিজ্ঞানও ছিল যথেষ্ট উন্নত। বিভিন্ন ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, গয়না ও মূর্তি এর প্রমাণ। ধাতু বিজ্ঞানের উন্নতির উদারহণ মেহরৌলির লোহার স্তম্ভটি। স্তম্ভটিতে আজও মরচে পড়েনি। তবে ধাতু

বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন লেখাপত্র বিশেষ পাওয়া যায়নি। ধাতু গলানোর কাজ রসায়নের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতেও রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার হতো। পাশাপাশি সুগন্ধি দ্রব্য ও খাদ্য তৈরিতেও রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল।
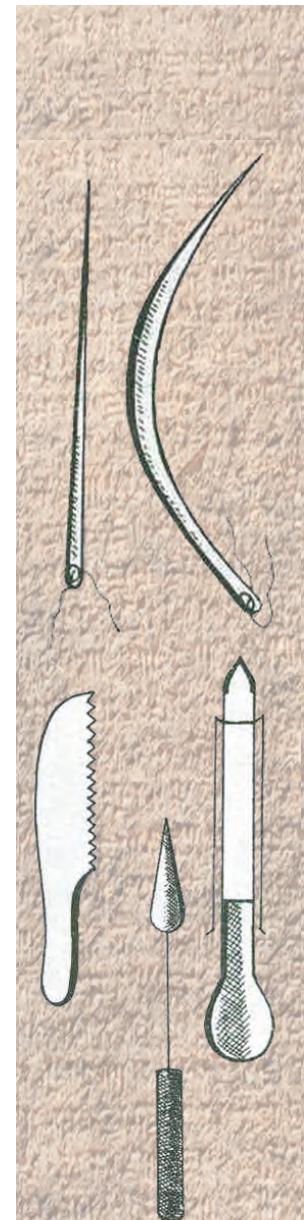
প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কৃষিই ছিল বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা। তাই কৃষিকাজ ও গাছপালা নিয়ে আলোচনাও বিজ্ঞানচর্চার আওতায় পড়েছিল। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল *কৃষিপরাশর* গ্রন্থে। কৃষির পাশাপাশি পশুপাখি নিয়েও বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রাচীন ভারতে হতো বলে জানা যায়।

ইট, পাথর ও ধাতুর ব্যবহার প্রাচীন ভারতের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে দেখা যায়। তার সঙ্গে ছিল নানা রকম যন্ত্র তৈরির কৌশল। তার থেকেই কারিগরি বিজ্ঞানের উন্নতির দিকটাও স্পষ্ট হয়। অস্ত্রোপচারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চিকিৎসকরা নিজেরা তৈরি করতেন না। দক্ষ কারিগরদের বিশেষ করে কামারের উপর তাদের নির্ভর করতে হতো। *শুশ্রুত সংহিতায়* বলা হয়েছে দক্ষ কামারের সঙ্গে চিকিৎসককে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেমন হবে তা কারিগরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই মতো কারিগর যন্ত্র তৈরি করে দেবেন। ধাতু ও দামি পাথরের বিচার ও পরখ করাও বিজ্ঞানের অংশ বলে ধরা হতো। খনি ও পাথরের বিষয়ে চর্চা ছিল বিজ্ঞানের আওতায়। বিভিন্ন ধাতু মেশানো এবং আলাদা করার চর্চাও হতো।

শুশ্রুত সংহিতায় কারিগরদের ও হাতের কাজকে প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে হাতই প্রধানতম যন্ত্র। অথচ ধর্মশাস্ত্রে কারিগরদের কাজকে নেহাতই হেয় করা হয়েছে। তার ফলে ধীরে ধীরে কারিগরি শিল্পচর্চা বিজ্ঞানচর্চা থেকে আলাদা হয়ে গেল। যদিও স্থাপত্য বানানোর কারিগরি শিল্প নষ্ট হয়ে যায়নি। ধর্মীয় প্রয়োজনেই বেশির ভাগ স্থাপত্য বানানো হতো। ফলে সেগুলি ছিল মন্দির ও মঠ। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সে ধরনের স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল।

ছবি. ৮.২: শুশ্রুত সংহিতা অনুযায়ী শল্যচিকিৎসার কয়েকটি যন্ত্রপাতি

টুকরো কথা
প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে পরিবেশ চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল বন, গাছপালা ও পশুপাখি। বন থেকে নানারকম সম্পদ পাওয়া যেত। ফলে বনের প্রতি শাসকদের বিশেষ নজর দিতে হতো। *অর্থশাস্ত্রে* বিভিন্নরকম বন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বনের ক্ষতি করলে কড়া শাস্তির কথাও বলা আছে। সম্রাট অশোক বেশ কিছু পশুপাখি মারতে নিষেধ করেছিলেন।

???

ভেবে দেখো

প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার জন্য কী কী বিষয় দায়ী বলে তোমার মনে হয়? আজকের পরিবেশ বাঁচাতে তোমরা দল বেঁধে কী কী কাজ করতে পারো, তার তালিকা বানাও।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ কৃষিকাজ ও নগর বসতি বাড়তে থাকে। ফলে জঙ্গল (অরণ্য) কাটা শুরু হয়। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় গ্রাম হলো চেনাজানা অঞ্চল। অন্যদিকে জঙ্গল হল অচেনা। জঙ্গলে থাকা মানুষজনও অদ্ভুত। জঙ্গলবাসীদের প্রায় সবসময়ই নীচু করে দেখানো হয়েছে। মহাকাব্যে দেখানো হয়েছে রাজপরিবারের কাউকে বিপদে ফেলার জন্য জঙ্গলে পাঠানো হতো। বনের পশুপাখি শিকারের অনেক উদাহরণ লেখাগুলিতে আছে। জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাও সেখানে পাওয়া যায়। *রাক্ষসরা* অনেকে বনেই থাকতেন। তারা ঋষিদের উৎপাত করতেন। রাজারা রাক্ষসদের হাত থেকে ঋষিদের রক্ষা করতেন। নগর যত বাড়তে থাকে, জঙ্গল ততই কমতে থাকে। তাই বিভিন্ন সময় গাছ বাঁচানোর নানান উপায় তৈরি করা হতো। যেমন, বট-অশ্বত্থ গাছকে পুজো করার চল শুরু হয়। তাই ঐসব গাছ তখন আর কাটা যেত না।

রোজকার জীবনে, কৃষিকাজে ও নানা ধর্মীয় কাজে জল ছিল খুব জরুরি। তাই জল ধরে রাখা, জলসেচ ও জলাশয় তৈরির নানান উদ্যোগ নেওয়া হতো। ধনী ব্যক্তিরা বিভিন্ন জলাশয় তৈরি করিয়ে দিতেন। তবে আজকের তুলনায় সেযুগে জনসংখ্যা অনেক কম ছিল। ফলে পরিবেশের ওপর চাপও কম পড়ত।

৮.৪ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পচর্চা

আদিম মানুষ একসময় গুহায় থাকতো। পরে এক সময়ে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকত তারা। তাতে দেয়ালগুলো দেখতেও সুন্দর হতো। অনেক পরে মানুষ বাড়ি বানাতে শুরু করেছিল। প্রয়োজন মতো কাঠ, পাথর, মাটি, ইট দিয়ে নানারকম স্থাপত্য বানিয়েছে মানুষ। তার পাশাপাশি বানিয়েছে নানারকম ভাস্কর্য। আর এঁকেছে ছবি। এইসব মিলিয়েই প্রাচীন আমলে শিল্পচর্চা চলতো। তার সঙ্গে হরেকরকম কারিগরি শিল্পের প্রচলনও ছিল।

প্রাচীন সমাজে স্থাপত্যগুলো মূলত দু-রকম কাজের জন্য বানানো হতো। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য স্থাপত্য বানানোর চল ছিল। ভাস্কর্য ও দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলিতেও ধর্মীয় নানা বিষয় ফুটে উঠতো। তাছাড়া ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে বানানো স্থাপত্য। বিরাট ইমারত বানানো হতো শাসকের ক্ষমতা বোঝানোর জন্য। বাড়ি, প্রাসাদ প্রভৃতি স্থাপত্য ছিল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। ধর্মীয় কারণে বানানো স্থাপত্যগুলি সব মানুষ ব্যবহার করতে পারতেন। বণিক, ব্যবসায়ীরাও স্থাপত্যের জন্য অর্থদান করতেন। কখনো আবার সাধারণ মানুষ স্তূপ বা মন্দির বানানোয় সাহায্য করতেন।

মৌর্য আমলের শিল্পচর্চা

হরপ্পা সভ্যতার পর ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য আমলেরই শিল্পের উদাহরণ পাওয়া যায়। মৌর্য শিল্পে পাথরের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছিল। ঐ শিল্পের বেশিরভাগ নিদর্শন ভাস্কর্য, স্থাপত্যের নজির খুব অল্প।
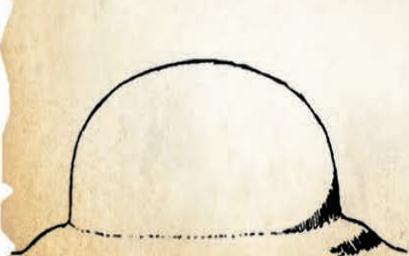
অশোক ও তার পরবর্তী মৌর্য সম্রাটরা আজীবিকদের জন্য *গুহাবাস* বানিয়ে দিয়েছিলেন। পাহাড় কেটে কৃত্রিম গুহা বানানো হতো। সেই গুহাগুলির ভিতরে মানুষ বাস করত বলে তাকে গুহাবাস বলা হতো। জানা যায় সম্রাট অশোক অনেকগুলি স্তূপ বানিয়ে দিয়েছিলেন বৌদ্ধদের জন্য। শুরুর দিকে স্তূপগুলি মাটির তৈরি হতো। অশোকের সময় অনেক স্তূপের উপর ইটের ব্যবহার শুরু হয়। ফলে স্তূপগুলি অনেক বেশি মজবুত ও স্থায়ী হয়েছিল। অশোকের আমলেই সারনাথ ও সাঁচীর স্তূপগুলি ফের বানানো হয়।

ছবি. ৮.৩ : ধামেক স্তূপ, সারনাথ

মৌর্য শিল্পের অন্যতম নজির অশোকের আমলে বানানো পাথরের স্তম্ভগুলি। স্তম্ভগুলির গায়ে কখনো কখনো লেখ খোদাই করা হতো। একটি পাথর থেকেই স্তম্ভগুলি তৈরি হতো। অশোকস্তম্ভ অনেকটা চক-খড়ির মতো দেখতে। স্তম্ভের ভিত মাটিতে পোঁতা থাকত। কোনো ঠেকা ছাড়াই স্তম্ভগুলো সোজা দাঁড়িয়ে থাকত। একটা মাত্র পাথর কেটেই তৈরি হতো বলে স্তম্ভগুলোকে মূলত ভাস্কর্য বলা যেতে পারে। স্তম্ভের একেবারে ওপরে বসানো থাকত একটা প্রাণীর মূর্তি। সিংহ, হাতি, ষাঁড় প্রভৃতি প্রাণীর মূর্তি সেক্ষেত্রে ব্যবহার হতো। এই জাতীয় পাথরের স্তম্ভ মৌর্য যুগের আগে দেখা যায়নি। এমনই একটি বিখ্যাত অশোকস্তম্ভ সারনাথে রয়েছে।

ছবি. ৮.৪: অশোকস্তম্ভ, রামপূর্বা

মৌর্য যুগের শিল্পে মানুষের মূর্তি বিশেষ দেখা যায়নি। মৌর্য শিল্প মূলত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছিল। জনসাধারণের জীবন যাপনের সঙ্গে মৌর্য শিল্পের বিশেষ যোগ ছিল না। তাই মৌর্য শিল্পের ছাপ পরবর্তী সময়ের শিল্পে বিশেষ দেখা যায় না।

ছবি. ৮.৪: অশোকস্তম্ভ, সারনাথ

সুঙ্গ-কুষাণ-সাতবাহন আমলে শিল্পচর্চা

মৌর্যদের পরবর্তী যুগে ভাস্কর্য বানানোর কাজে পাথরের পাশাপাশি পোড়ামাটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ফলে সেই সময় শিল্পচর্চা পুরোপুরি শাসকের অনুগ্রহের উপরে নির্ভরশীল ছিল না। সুঙ্গ, কুষাণ ও সাতবাহন আমলে সাধারণ জীবনের ছাপ শিল্পের উপর পড়েছিল। তবে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গেও শিল্পের যোগাযোগ ছিল। এই সময় ধর্মীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সেরা নজির স্তূপ, চৈত্য ও বিহার। প্রধানত বৌদ্ধধর্মচর্চার সঙ্গেই এই স্থাপত্য শিল্পগুলি জড়িত। তবে জৈন ধর্মেও স্তূপ বানানোর নজির রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্থাপত্যের নজির এই আমলে খুবই সামান্য।

সুঙ্গ-কুষাণ যুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাস্কর্যের বিষয় ছিল বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম। এই আমলের শিল্পে রাজদরবারের সরাসরি প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। তবে প্রকৃতি এবং রোজকার জীবনের নানা দিক ভাস্কর্য শিল্পে ফুটে উঠেছে। তোরণের ভাস্কর্যগুলি অনেক সময় যেন একটি টানা গল্প বলে চলেছে।

শক-কুষাণ যুগে গন্ধার ও মথুরার শিল্পরীতি ছিল খুব বিখ্যাত। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম এই দুই শিল্পরীতির মূল বিষয়। গন্ধার ভাস্কর্যে প্রধানত গ্রিক ও রোমান প্রভাব দেখা যায়। মথুরা রীতির ভাস্কর্যে লাল চুনাপাথরের বেশি ব্যবহার হতো।

ছবি. ৮.৬: সুঙ্গ আমলের পোড়ামাটির ভাস্কর্য, চন্দ্রকেতুগড়

ছবি. ৮.৭: ভারহুতের ভাস্কর্য

ছবি. ৮.৮: গৌতম বুদ্ধ, মথুরা শৈলী

ছবি. ৮.৯: অমরাবতীর ভাস্কর্য

ছবি. ৮.১০: গৌতম বুদ্ধের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য, গন্ধার ভাস্কর্য

টুকরো কথা
স্তূপ-চৈত্য-বিহার

জানা যায়, গৌতম বুদ্ধ তাঁর দেহাবশেষের উপর **স্তূপ** বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্ধ-গোলাকার মাটির ঢিবিগুলোই ছিল মৌর্য যুগের আগের স্তূপ। মৌর্য পরবর্তী সময়ে স্তূপ বানানো সংখ্যায় অনেক বেড়ে যায়। স্তূপের চারদিকে চারটি বড়ো দরজা থাকত। সেগুলিকে **তোরণ** বলা হয়। তোরণগুলিতে ভাস্কর্য খোদাই করা হতো। স্তূপের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উপাসনা করার জন্য পথও থাকত। শাসক ও ধনী ব্যক্তিদের উদ্যোগে স্তূপগুলি তৈরি হতো। ভারহুত, সাঁচী ও অমরাবতীর স্তূপগুলি স্থাপত্য হিসাবে বিখ্যাত।

ছবি. ৮.১১:
সাঁচী স্তূপ ও স্তূপের ভিতরের দেয়ালে বুদ্ধের একটি ভাস্কর্য

স্তূপের সঙ্গে সঙ্গে বানানো হতো **চৈত্য**। সরাসরি পাহাড় কেটে গুহাবাস হিসাবেই বেশিরভাগ চৈত্য বানানো হতো। চৈত্যের আকার হতো লম্বাটে ধরনের। চৈত্যের শেষ প্রান্তে উপাসনার জন্য একটি স্তূপ থাকত। সাতবাহন যুগে নাসিক, পিতলখোরা, কার্লে প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্য বানানো হয়েছিল।

বৌদ্ধ বিহার বা সংঘারামগুলিও স্থাপত্য শিল্পের উদাহরণ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকার ও পড়াশোনার জন্যই বিহারগুলি তৈরি হতো। বিহারগুলি আদতে ছিল অনেকগুলি গুহার সমষ্টি। পরবর্তীকালে ইট দিয়ে বিহার তৈরি করা হতো।

ছবি. ৮.১২: অজন্তার চৈত্য গুহা

ছবি. ৮.১৩: নালন্দা মহাবিহারে সারিপুত্ত স্তূপ

গুপ্ত ও পল্লব আমলের শিল্প চর্চা

গুপ্ত আমলেও শিল্পচর্চার সঙ্গে ধর্মীয় ধ্যানধারণার যোগাযোগ দেখা যায়। পাথরের পাশাপাশি পোড়ামাটির ব্যবহারও এইসময় ভাস্কর্যে লক্ষ করা যায়।

স্তূপ ও চৈত্য বানানো গুপ্ত আমলেও চালু ছিল। সারনাথের ধামেক স্তূপ প্রথমে ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল। এই আমলে তার উপরে পাথরের আস্তরণ দেওয়া হয়। গুপ্ত আমলে প্রথম স্থাপত্য হিসাবে মন্দির বানানো শুরু হয়। মন্দির কখনো ইট কখনো পাথর দিয়ে তৈরি হতো। এই আমলের মন্দিরগুলির মধ্যে দেওঘরের দশাবতার মন্দির বিখ্যাত। পাশাপাশি পাহাড় ও পাথর কেটে মন্দির তৈরির চল ছিল। পল্লব আমলে মহাবলীপুরমে পাথর কেটে রথের মতো দেখতে মন্দির তৈরি হয়েছিল। গুপ্তযুগের শিল্পের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ খুব স্পষ্ট।

গুপ্তযুগ ও পল্লবযুগের মন্দিরগুলির দেয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল। যেমন কৈলাস মন্দিরে রামায়ণের প্যানেল, দশাবতার মন্দিরের ভাস্কর্য। গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পের সবথেকে বিখ্যাত উদাহরণ মধ্য ভারতে অজন্তা গুহার ছবিগুলি। বিভিন্ন গাছপালা ও মানুষের ছবি সেখানে রয়েছে। নানাধরনের অজন্তা গুহার ছবিগুলিতে দেখা যায়। রংগুলি বিভিন্ন পাথর, মাটি ও গাছ-গাছড়ার উপাদান দিয়ে তৈরি করা হতো। অজন্তা ছাড়াও ইলোরা এবং বাঘ গুহাতে বেশ কিছু ছবি পাওয়া গেছে।

ছবি. ৮.১৪:
দশাবতার মন্দির, দেওঘর

ছবি.৮.১৫: বৌদ্ধ ভিক্ষু, অজন্তা গুহাচিত্র

ছবি.৮.১৬: ইলোরা গুহাচিত্র

টুকরো কথা

চন্দ্রকেতুগড়

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেড়াচাঁপায় পাওয়া গেছে প্রাচীন বাংলার প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ। চন্দ্রকেতুগড় বিদ্যাধরী নদীর মাধ্যমে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটি ছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। আবার অন্যদিকে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। এখানে মৌর্য আমলের আগে থেকে (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬০০-৩০০ খ্রিঃ পূঃ অব্দ) পাল-সেন আমল পর্যন্ত (আনুমানিক ৭৫০-১২৫০ খ্রিঃ অব্দ) সময় কালের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন নানা ধরনের মাটির পাত্র, সিলমোহর, মূর্তি প্রভৃতি। এখানে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি পাওয়া গেছে। যার মধ্যে নারীমূর্তির সংখ্যা বেশি।

ছবি.৮.১৭: পোড়ামাটির ভাস্কর্য, চন্দ্রকেতুগড়

ছবি. ৮.১৯: সুঙ্গ আমলের রাজপরিবার, টেরাকোটা, বাংলা, খ্রিস্টীয় প্রথম শতক

ছবি. ৮.১৮ ও ৮.২০: সাঁচী স্তূপের পূর্বদিকের তোরণের গায়ের ভাস্কর্য

ভেবে দেখো

১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :

১.১) নালন্দা, তক্ষশিলা, বলভী, পাটলিপুত্র।

১.২) ব্রাহ্মী, সংস্কৃত, খরোষ্ঠি, দেবনাগরী

১.৩) রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিকম, অর্থশাস্ত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলম।

২। নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :

২.১) নালন্দা মহাবিহারে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই পড়তে পারত।

২.২) কম্বনের রামায়ণে রামকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

২.৩) বাগভট ছিলেন একজন চিকিৎসক।

২.৪) কুষাণ আমলে গন্ধার শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

৩। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
মহাবলীপুরম	কুষাণ যুগ
গন্ধার শিল্পরীতি	নাগার্জুন
গণিতবিদ	তামিল মহাকাব্য
মণিমেখলাই	গুহাচিত্র
অজন্তা	রথের মতো মন্দির

৪। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৪.১) প্রাচীনকালের বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আজকের শিক্ষাব্যবস্থার মিল-অমিলগুলি নিজের ভাষায় লেখো।

৪.২) চরক সংহিতায় আদর্শ হাসপাতাল কেমন হবে, তা বলা আছে। তোমার মতে একটি ভালো হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত?

৪.৩) একটি বিহার ও স্তূপের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখো।

৫। হাতেকলমে করো :
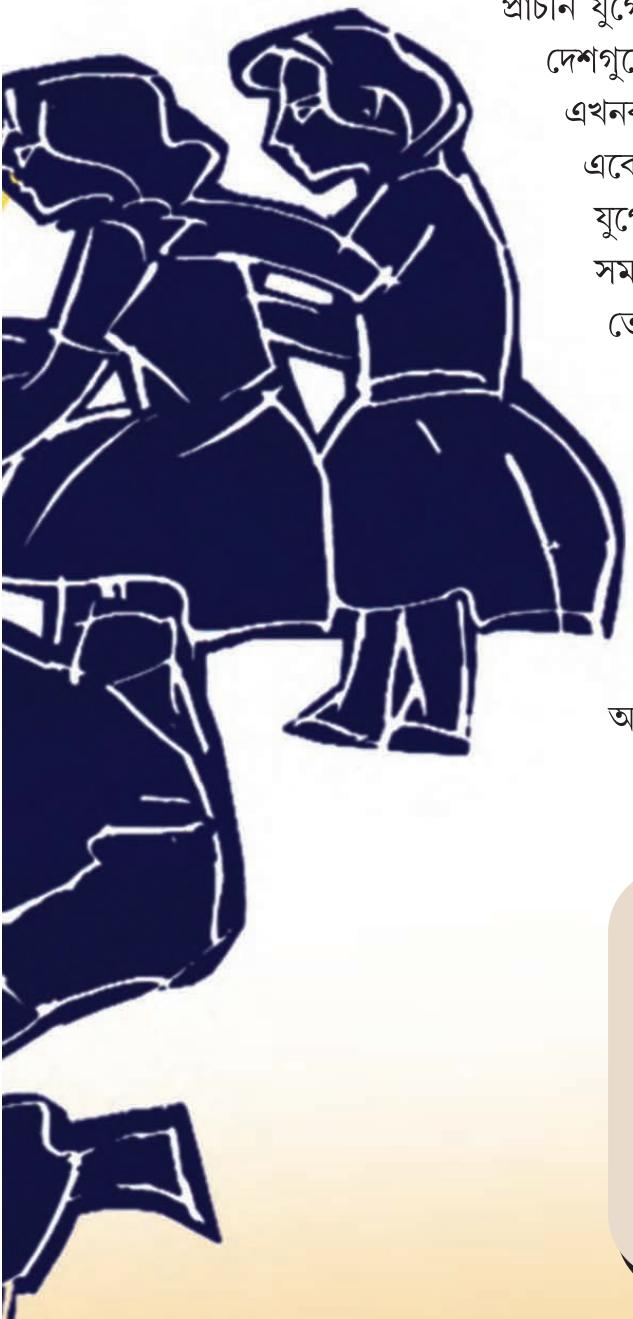
মাটি/থার্মোকল দিয়ে চৈত্য/বিহার/স্তূপের মডেল তৈরি করো।

ভারত ও সমকালীন বহির্বিশ্ব

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত

রুবির বাড়ি যেতে সবাই সবসময় রাজি। রুবির দাদু এতরকম গল্প বলেন। মজার মজার খেলা শেখান। কয়েকদিন ধরেই দাদু ওদের নিয়ে একটা মজার খেলা খেলছেন। একটা ইয়া বড়ো পৃথিবীর

মানচিত্র মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তাতে কত জায়গার নাম। তার সঙ্গে নদী-পাহাড় সব কিছু। এবারে সবাই কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে যায়। তারপর একদল অন্যদলকে একটা নাম বলে। যেটা খুঁজতে হয় মানচিত্রে। পারলে পয়েন্ট পাওয়া যায়। না পারলে পয়েন্ট কাটা যায়। এভাবে চলতে থাকে খেলা। সবাই মশগুল হয়ে খেলে। আর খেলার শেষে বোঝে কত কিছু শেখা হলো, আবার খেলাও হলো।

একদিন খেলার মাঝে সুরাইয়া দাদুকে প্রশ্ন করল। আচ্ছা দাদু, এই যে মানচিত্রে এত দেশ, এসব কী প্রাচীন যুগে ছিল? দাদু বললেন, পৃথিবীর মানচিত্র বারবার বদলেছে। যে দেশগুলো এখনকার মানচিত্রে দেখছ প্রাচীন যুগে সেগুলো ছিল না। এখনকার অনেকগুলো দেশ বা অঞ্চল জুড়ে তৈরি হয়েছিল সে যুগের একেকটা সভ্যতা। সেই সভ্যতাগুলির মধ্যে যোগাযোগও ছিল। প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলির কথা তো জেনেছ। ঐ সময়ে পৃথিবীর নানা জায়গায় অন্যান্য সভ্যতার কথাও কিছুটা তোমাদের জানা। সেই সভ্যতাগুলির সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলির যোগাযোগ নানাভাবে গড়ে উঠেছিল।

পরদিন ইতিহাস ক্লাসে পলাশ দিদিমণিকে দাদুর কথাগুলো বলল। দিদিমণি বললেন, হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে ঐ সময়ের অন্যান্য সভ্যতার যোগাযোগের কথা আগেই জেনেছ। সেই যোগাযোগ তার পরবর্তী সময়েও ছিল। তবে যোগাযোগের নানা রকম দিক ছিল। এবারে দিদিমণি বোর্ডে একটা ছক আঁকলেন।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চল ও সুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি সভ্যতা

মানচিত্র.৯.১:
প্রাচীন বিশ্বের

প্রাচীন মিশর অঞ্চল ও মিশরীয় সভ্যতা

প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্য

কয়েকটি সভ্যতা

প্রাচীন চিন সভ্যতা

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা

প্রাচীন রোমান সভ্যতা

টুকরো কথা

এক নজরে প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা

❒ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানের অঞ্চলকে গ্রিকরা বলতো **মেসোপটেমিয়া**। ঐ শব্দটির মানে দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। ❒ প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের একটা অংশে ছিল সুমেরীয় সভ্যতা। ❒ সুমেরের লিপিকে ইংরেজিতে বলে **কিউনিফর্ম**। ❒ সুমেরের লোকেরা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করত। ❒ সুমেরের লোকেরা প্রথম কাঠের চাকার ব্যবহার শুরু করেছিল। ❒ সুমের ছাড়াও মেসোপটেমিয়ার আরেকটি বিখ্যাত সভ্যতা হলো ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি প্রথম লিখিত আইন চালু করেছিলেন।

❍ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় নীল নদের তীর বরাবর ছিল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরকে বলেছিলেন **নীলনদের দান**। ❍ মিশরের শাসকদের **ফ্যারাও** বলা হতো। তাদের মৃতদেহ রাখার জন্য পিরামিড বানানো হতো। ❍ মিশরে প্যাপিরাস গাছের ছালে লেখা শুরু হয়। প্যাপিরাস থেকেই কাগজের ইংরেজি শব্দ পেপার এসেছে। ❍ বর্ণ ও ছবি মিলিয়ে মিশরে একরকম লেখার ব্যবহার হতো। তাকে মিশরীয় **হায়ারোগ্লিফ** লিপি বলা হয়। ❍ মিশরের ল্যাপিস লাজুলি পাথর ভারতীয় উপমহাদেশে আমদানি করা হতো।

❒ এশিয়া মহাদেশের পূর্বে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর অববাহিকায় ছিল প্রাচীন চিন সভ্যতা। ❒ প্রথম কাগজ বানানোর ও কাঠের হরফ বানিয়ে ছাপার কৌশলও চিনেই তৈরি হয়েছিল। ❒ বাইরের আক্রমণ ঠেকাতে চিনের শাসকরা পাঁচিল দিয়ে সাম্রাজ্য ঘিরে রেখেছিলেন। সেই বিরাট পাঁচিলগুলিকে একসঙ্গে চিনের প্রাচীর বলা হয়। ❒ চিনে বারুদের ব্যবহার হতো।

❍ পাহাড়ে ঘেরা গ্রিসে অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সেগুলিকে বলা হতো নগর রাষ্ট্র বা পলিস। পলিসগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল এথেন্স ও স্পার্টা। তাদের সঙ্গে পারসিক সাম্রাজ্যের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধের কথা গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর লেখায় পাওয়া যায়। ❍ এথেন্স ও স্পার্টা নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ করেছিল। গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস সেই যুদ্ধের কথা লিখেছিলেন। ❍ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত ও নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতো। পারসিক ও অন্যান্য সভ্যতার ছাপ গ্রিক সভ্যতায় পড়েছিল।

❒ পারস্য উপসাগরের উত্তরে গড়ে উঠেছিল বিরাট পারসিক সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পারসিক সংস্কৃতিও ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। ❒ কুরুষ ও প্রথম দরায়বৌষ ছিলেন দুজন বিখ্যাত পারসিক সম্রাট।

❍ ভূমধ্যসাগরের ইটালির উপকূল ঘিরে ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতা। ধীরে ধীরে রোমানরা বিরাট সাম্রাজ্য বানিয়েছিল। ❍ গ্রিসের ও অন্যান্য সভ্যতার ছাপ রোমের সভ্যতায় পড়েছিল। রোমে রাজনীতি, আইন, শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের নানা উন্নতি হয়েছিল। ❍ রোমের রাজকর্মচারীর আদেশেই জেরুজালেমে যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়।

এই সভ্যতাগুলির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

৯.১ ভারত ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র খেয়াল করো। দেখবে যে, উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে বেশ কয়েকটি গিরিপথ। উত্তর-পশ্চিমের ঐ গিরিপথগুলি ধরেই পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে উপমহাদেশের যোগাযোগ ঘটত। অন্যদিকে হিমালয় পর্বতশ্রেণির গিরিপথ দিয়ে চিন ও তিব্বত-এর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় ছিল। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথের মধ্যে দিয়েই বিদেশিরা উপমহাদেশে এসেছে। ঐ পথ ধরেই বিদেশি রাজনৈতিক শক্তিগুলি উপমহাদেশে ক্ষমতা কায়েম করেছে। আবার পাশাপাশি ঐ পথ ধরে ব্যবসাবাণিজ্যও চলেছে। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও হয়েছে। তাছাড়া সমুদ্রপথেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় চলত।

৯.১.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম

ভারতীয় উপমহাদেশে ইন্দো-ইরানীয়দের আগমন বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। ভৌগোলিক কারণেই উত্তর-পশ্চিম অংশের স্থলপথ দিয়েই বেশিরভাগ বিদেশিজাতি ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল পারসিকরা।

ভারতীয় উপমহাদেশ ও পারস্যের যোগাযোগ

উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল গন্ধার। গন্ধারের মধ্যে দিয়ে পারসিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে উপমহাদেশের যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ভাগে পারস্যের হখামনীষীয় শাসকরা গন্ধার অভিযান করেছিলেন। তাদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন প্রথম দরায়বৌষ বা দরায়ুষ (খ্রিস্টপূর্ব ৫২২-৪৮৬ অব্দ)। তাঁর শাসন গন্ধার ছাড়াও উপমহাদেশের বেশ কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর একটি লেখতে *হিদুষ* শব্দটি পাওয়া যায়। সিন্ধু নদ থেকেই ওই শব্দটি তৈরি হয়েছিল। মনে হয় যে, নিম্ন সিন্ধু এলাকা দরায়বৌষের শাসনের মধ্যে ছিল।

গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় *ইন্দুস* বা *ইন্ডিয়া* ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বা স্যাট্রাপি। দরায়বৌষ নিম্ন সিন্ধু এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর দখল কায়েম করার জন্যই ঐ অঞ্চল জয় করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ পারসিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত ছিল।

ছবি.৯.১:
নকস-ই রুস্তম-এর ছবি। এখানে পারসিক সম্রাট প্রথম দরায়বৌষের সমাধি রয়েছে

পারসিক শাসক তৃতীয় দরায়বৌষ-এর (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩৩০ অব্দ) সময়ে আলেকজান্ডার পারস্য অভিযান করেন। তাতে পারসিকরা হেরে যায়। ফলে হখামনীষীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। গন্ধার ও নিম্ন সিন্ধু এলাকাতেও আর পারসিক অধিকার রইল না।

ছবি.৯.২: পার্সিপোলিস নগরের ধ্বংসাবশেষ

উপমহাদেশের সামান্য অংশেই পারসিক শাসন ছিল। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে তার নানারকম প্রভাব পরেও দেখা যায়। হখামনীষীয়রা প্রাদেশিক শাসক হিসেবে স্যাট্রাপদের নিয়োগ করতেন। পরবর্তী সময় শক ও কুষাণ শাসকরাও স্যাট্রাপ ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। তাদের সময় স্যাট্রাপরা হয়ে গিয়েছিল ক্ষত্রপ। তাছাড়া শাসকরা সরাসরি তাদের প্রজাদের কাছে সরকারি আদেশ-নির্দেশ প্রচার করতেন লেখর মাধ্যমে। পরে মৌর্য সম্রাট অশোক প্রায় একইভাবে সাম্রাজ্যে লেখর মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রচার করতেন।

ভারতীয় উপমহাদেশ ও গ্রিসের যোগাযোগ

গ্রিক শাসক আলেকজান্ডার পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তার জন্যই পারসিকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। পারসিকদের হারিয়ে আলেকজান্ডার পৌঁছে যান ভারতীয় উপমহাদেশে। উপমহাদেশে পারসিক শাসন শেষ হয় আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে। এবিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। আলেকজান্ডার বেশি দিন উপমহাদেশে ছিলেন না। ফলে ঐ অভিযানের প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশে খুব গভীরভাবে পড়েনি। আলেকজান্ডারের অভিযানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু শাসক লড়াই করেছিলেন। আবার অনেক শাসক গ্রিক বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেকজান্ডারকে সহযোগিতা করেন। তবে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে ছোটো ছোটো শক্তিগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তার ফলেই মগধের ক্ষমতা বিস্তার সহজ হয়।

ছবি.৯.৩: আলেকজান্ডারের একটি সোনার মুদ্রার দু-পিঠ

ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ

মৌর্য শাসনের শেষ দিকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বেশ কিছু বদল ঘটেছিল। পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে উপমহাদেশের রাজনীতি ও শাসন জড়িয়ে যাচ্ছিল। উপমহাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে গ্রিক, শক-পহ্লবদের শাসন দেখা গিয়েছিল। পুষ্যমিত্র সুঙ্গের সময়েই গ্রিক রাজারা বেশ কিছু অঞ্চল দখল করেছিল। এই গ্রিক রাজাদের অনেকেই আদতে ব্যাকট্রিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছিল বাহ্লীক দেশ বা ব্যাকট্রিয়া। এটি ছিল হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ এখনকার আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে।
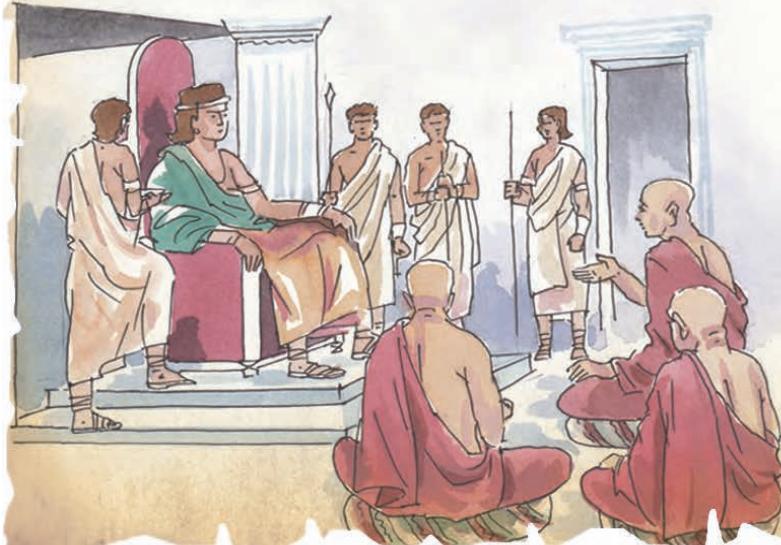
সেই ব্যাকট্রিয়া খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ দিকে গ্রিক শাসক সেলিউকাসের অধীনে ছিল। ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক রাজাদেরই *যবন* বলা হয়েছে পুরাণ সাহিত্যে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, গন্ধারের তক্ষশিলা পর্যন্ত ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক শাসন ছিল। উপমহাদেশের এই গ্রিক শাসকদের বলা হয় *ব্যাকট্রীয়-গ্রিক* বা *ইন্দো-গ্রিক* শাসক।

ছবি.৯.৪:গ্রিক শাসক সেলিউকাসের মুদ্রা

টুকরো কথা
মিনান্দার

ঐ সময় ইন্দো-গ্রিক রাজাদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত ছিলেন **মিনান্দার**। ব্যাকট্রিয়া এলাকায় তাঁর শাসন ছিল। প্রাচীন গন্ধার ও কান্দাহার অঞ্চলে মিনান্দারের শাসন ছিল। ব্যাকট্রিয়ার কিছু অংশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা খানিকটা তাঁর অধীনে ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনি **মিলিন্দ** নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের প্রভাবে মিনান্দার বৌদ্ধ ধর্ম নেন। নাগসেনকে মিনান্দার বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। সেই কথাবার্তা **মিলিন্দপঞহো** বা **মিলিন্দপ্রশ্ন** বইতে রয়েছে। ঐ বই থেকেই জানা যায় মিনান্দারের রাজধানী ছিল সাকল বা এখনকার পাকিস্তানের শিয়ালকোট। তিনি বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগও নিয়েছিলেন।

ছবি.৯.৫: গ্রিক শাসক মিনান্দারের মুদ্রা

খ্রিস্টপূর্ব ১৩০ অব্দ নাগাদ মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠীর আক্রমণে ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক শাসন শেষ হয়। ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিল স্কাইথীয়রা। উপমহাদেশে তারা *সেক* বা *শক* নামে পরিচিত ছিল। আর ছিল ইউয়ে-*ঝি* বা *কুষাণ*। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে তারা ব্যাকট্রিয়ায় পৌঁছেছিল। কাশ্মীর, সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের এলাকা ও তক্ষশিলা শকদের দখলে ছিল। অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের গোড়ার দিকে কাবুল এলাকা *পার্থীয়*দের হাতে চলে যায়। পার্থীয়রা ইরান থেকে উপমহাদেশে এসেছিল। পার্থীয়রাই উপমহাদেশে *পহ্লব* নামে পরিচিত ছিল।

শক শাসনের বাধা ছিল পহ্লব শাসকরা। পহ্লব রাজা গন্ডোফারনেস আনুমানিক ২০ বা ২১ খ্রিস্টাব্দে শাসন শুরু করেন। সম্ভবত শকদের হারিয়ে প্রাচীন গন্ধারের এক অংশ তিনি দখল করেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং পুরো সিন্ধু উপত্যকা গন্ডোফারনেসের অধীনে ছিল। ফলে বিরাট অঞ্চলের শাসক হিসেবে তিনিও নিজের মুদ্রায় *রাজাধিরাজ* উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর আমলে সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য উপমহাদেশে এসেছিলেন। কুষাণ শাসন শুরু হওয়ার ফলে শক ও পহ্লবদের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। মূলত পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে শক শাসন টিকে ছিল।

উপমহাদেশ ও বাইরের পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের আরেক মাধ্যম ছিল দূত বিনিময়। মূলত মৌর্য সম্রাটদের সময় থেকেই সেই দূত বিনিময় শুরু হয়েছিল। সেই দূতেরা অনেকেই তাঁদের অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছিলেন।

গ্রিক শাসক সেলিউকাসের দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় গিয়েছিলেন। ঐ একই সময়েই সেলিউকাসের দূত হয়ে মৌর্য দরবারে গিয়েছিলেন ডায়ামাকাস। মিশরের শাসক টলেমি ডায়োনিসিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন দূত হিসেবে মৌর্যদের কাছে। মৌর্য সম্রাটরাও তাঁদের দূত পাঠাতেন বিদেশি শাসকদের সভায়।

বিন্দুসারের সঙ্গে সিরিয়ার শাসক প্রথম অ্যান্টিওকস-এর যোগাযোগ ছিল। বিন্দুসার নাকি গ্রিক রাজার কাছে কয়েকটি জিনিস ও একজন পণ্ডিত চেয়েছিলেন। সিরিয়ার শাসক সব জিনিস পাঠালেও পণ্ডিত পাঠাননি। এই ঘটনা কতটা বাস্তব তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে বোঝা যায় পশ্চিম এশিয়ার গ্রিকদের সঙ্গে মৌর্যরা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।

সম্রাট অশোক উপমহাদেশের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সিংহল প্রভৃতি জায়গায় অশোক দূত পাঠিয়েছিলেন। রাজগৃহে পাওয়া একটি লেখ থেকে হর্ষবর্ধনের সময় চিনের সঙ্গে দূত বিনিময়ের বিষয়ে জানা যায়।

টুকরো কথা

হূণ আক্রমণ

আনুমানিক ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে হূণরা ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান করেছিল। তখন স্কন্দগুপ্তের শাসন-কাল। তিনি হূণ অভিযানকে সফলভাবে আটকে দিতে পেরে-ছিলেন। তারপর অনেক দিন হূণ অভিযান উপমহাদেশে হয়নি। পঞ্চম শতকের শেষ ও ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় হূণরা আবার শক্তিশালী হয়। সেসময় তাদের নেতা ছিলেন তোরমান এবং মিহিরকুল। উপমহাদেশের কিছু অঞ্চলে তোরমানের শাসন ছিল। তোরমানের ছেলে মিহিরকুল (৫২০ - ৫৩৫ খ্রি.) ছিলেন ক্ষমতাবান শাসক। হূণরা গুপ্ত শাসনের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হূণশাসনের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার স্থল-বাণিজ্যে ভাটা দেখা দেয়।

মনে রেখো

শক শাসক প্রথম অয় একটি অব্দ চালু করেছিলেন। সেই অব্দটি **অয়অব্দ** এবং **বিক্রমাব্দ** দুই নামেই পরিচিত। কান্দাহার থেকে উত্তর -পশ্চিম সীমান্তের এলাকায় প্রথম অয়-র অধিকার ছিল। আস্তে আস্তে শক শাসন উত্তর ভারতে এবং গঙ্গা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

৯.১.২ অর্থনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যে সেই বাণিজ্যিক যোগাযোগ সবথেকে বেড়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লেনদেন চলত। জলপথ ও স্থলপথে ঐ যোগাযোগ হতো। রোম সাম্রাজ্যে ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে চিন ও ভারতের নানা জিনিসের চাহিদা ছিল। এদের মধ্যে সবথেকে বেশি কদর ছিল চিনা রেশমের। তাকলামাকান মরুভূমিকে এড়িয়ে দুটি পথে চিনা রেশম নিয়ে যাওয়া হতো। ঐ পথদুটি কাশগড়ে গিয়ে মিশত। সেখান থেকে বিভিন্ন পথ পেরিয়ে রেশম পৌঁছে যেত ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের এলাকায়। রেশম ছিল ঐ স্থলপথগুলির প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। তবে সেইসময়ে *রেশম পথ* বলে কোনো নাম ছিল না। অনেক পরে খ্রিস্টীয় উনিশ শতকে ঐ পথকে রেশম পথ বলা হতো। এই বিরাট অঞ্চলের কিছু অংশ এক সময় পার্থীয়দের দখলে ছিল। পরে কুষাণরা ব্যাকট্রিয়া দখল করেন। তার ফলে রেশম পথের একটি শাখা দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। রেশম বাণিজ্য থেকে কুষাণ শাসকরা অনেক শুল্ক আদায় করতেন। ঐ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ উপমহাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জড়ো হতেন।

ছবি. ৯.৬:
ইউমেন পাস, গোবি মরুভূমি অঞ্চলে রেশম পথের একটি শুল্ক কেন্দ্র।
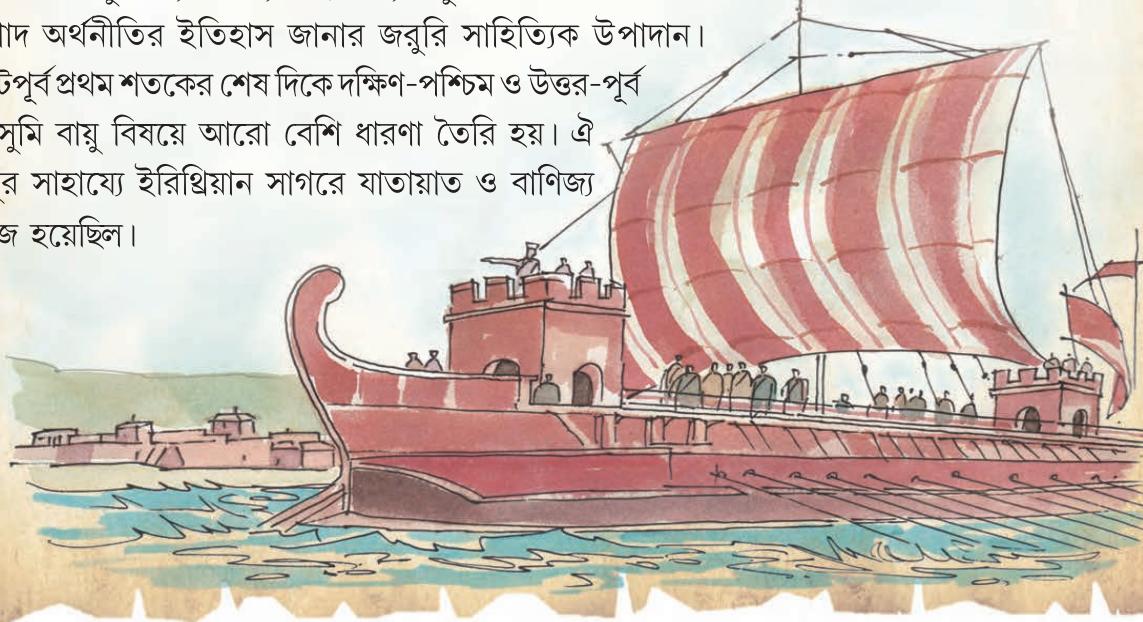
টুকরো কথা
পেরিপ্লাস ও মৌসুমি বায়ু

ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরকে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ভূগোলে **ইরিথ্রিয়ান সাগর** বলা হতো। সেই ইরিথ্রিয়ান সাগরে যাতায়াত ও বাণিজ্য বিষয়ে একটি বই লেখা হয়েছিল। তার নাম ***পেরিপ্লাস অভ দ্য ইরিথ্রিয়ান সী***। পেরিপ্লাস কথাটার দুটো মানে হয়। জলযানে করে ঘুরে বেড়ানো। আবার জলপথে যাতায়াতের বর্ণনা। সেভাবে ধরলে বইটির নামের বাংলা মানে হতে পারে ইরিথ্রিয়ান সাগরে ভ্রমণ। বইটির লেখকের নাম জানা যায় না। বইটি গ্রিক ভাষায় লেখা। বইটির লেখক একজন গ্রিক, যিনি মিশরে থাকতেন।

বইটি লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন। তাই বইটিতে ইরিথ্রিয়ান সাগরের বন্দর ও ব্যবসাবাণিজ্যের নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে। বণিকদের সুবিধার জন্য লেখা হয়েছিল বইটি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে মাঝামাঝি সময়ে বইটি লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজন, সমাজ, গাছপালা, পশু-পাখি বিষয়েও নানা কথা। এই বইটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতক নাগাদ অর্থনীতির ইতিহাস জানার জরুরি সাহিত্যিক উপাদান।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বিষয়ে আরো বেশি ধারণা তৈরি হয়। ঐ বায়ুর সাহায্যে ইরিথ্রিয়ান সাগরে যাতায়াত ও বাণিজ্য সহজ হয়েছিল।

সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের দুই উপকূলের বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সঙ্গে রোমের বাণিজ্য চলত। পশ্চিম উপকূলের সেরা বন্দর ছিল নর্মদা নদীর মোহনায় ভৃগুকচ্ছ। উত্তরের কোঙ্কন উপকূলে বেশ কয়েকটি বন্দর ছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত ছিল কল্যাণ বন্দর। শক শাসক নহপান ঐ বন্দরটি অবরোধ করেছিলেন। মালাবার উপকূলের বন্দরগুলি দিয়ে গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলার বাণিজ্য চলত। এখনকার তামিলনাড়ু উপকূলেও ছিল বেশ কিছু বন্দর। কাবেরী ব-দ্বীপ এলাকায় বিখ্যাত বন্দর ছিল কাবেরীপট্টিনম। অন্ধ্র উপকূলেও কয়েকটি বন্দরের কথা জানা যায়। সেখানে সম্ভবত জাহাজ ছাড়ার জায়গাও ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরো পূর্ব উপকূলের গুরুত্ব ছিল।

টুকরো কথা
বন্দর-নগর : তাম্রলিপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের একটি পরিচিত বন্দর-নগর ছিল তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্তি, দামলিপ্ত প্রভৃতি নামেও এই নগরের পরিচয় দেওয়া হতো। বিদেশি লেখকদের বর্ণনায় তামালিতেস (গ্রিক) নামও পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত এই সামুদ্রিক বন্দরের কাজকর্ম জারি ছিল। সুয়ান জাং বলেছেন, তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের একটি খাঁড়ির উপরে রয়েছে। সেখানে স্থলপথ ও জলপথ এসে মিশেছে। সম্ভবত, সেটি ছিল এখনকার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের কাছাকাছি। ঐ বন্দর থেকেই ফাসিয়ান জাহাজে উঠেছিলেন। স্থলপথেও তাম্রলিপ্ত যাতায়াত করা সহজ ছিল। বাণিজ্য ছাড়া তাম্রলিপ্ত নগর পড়াশোনার কারণেও বিখ্যাত ছিল। তবে নদীখাত শুকিয়ে যাওয়ার ফলে বন্দর-নগরটির গুরুত্ব কমতে থাকে। নগর হিসাবেও তার খ্যাতি নষ্ট হয়।

???

ভেবে দেখো

এই পুরো বই জুড়ে প্রাচীন বাংলার কোন কোন অঞ্চলের নাম রয়েছে তার একটা তালিকা বানাও। ঐ অঞ্চলগুলি কী কী কারণে বিখ্যাত ছিল?

৯.১.৩ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম

উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগের আরেক মাধ্যম ছিল সাংস্কৃতিক বিনিময়। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মেলামেশার মাধ্যমে ঐ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হতো। এর ফলে উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে নানা বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি ঐ জাতি-উপজাতিগুলির অনেকে মিশে গিয়েছিল উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে।

পারসিক সাম্রাজ্যের অধীন এলাকাগুলিতে আরামীয় ভাষা ও লিপি চলত। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে ঐ ভাষা ও লিপি ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকও ঐ অঞ্চলে আরামীয় ভাষা ও লিপি ব্যবহার করেন। ঐ আরামীয় লিপি থেকে সম্ভবত খরোষ্ঠী লিপি তৈরি হয়েছিল। দুটি লিপিই ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে লেখা হতো। পারসিক শাসকরা উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানাতেন। সম্ভবত তার প্রভাব পড়েছিল মৌর্য শাসকদের উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানানোর ভাবনায়। আলেকজান্ডার পারসিক সাম্রাজ্যের পার্সিপোলিস নগরী ধ্বংস করে দেন। তার ফলে পারসিক শিল্পীরা অনেকেই উপমহাদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। ঐ শিল্পীদের হাতে ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য শিল্প শুরু হয়েছিল।

আলেকজান্ডার ভারতীয় উপমহাদেশে কয়েকটি নগর তৈরি করেছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ও সেই নগরগুলি ছিল। সেগুলিতে গ্রিকরা থাকত। ধীরে

ধীরে ঐ গ্রিকরা উপমহাদেশের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়। তারা বৌদ্ধধর্মের চর্চাও করতে থাকে। অন্যদিকে গ্রিকদের থেকে নতুন ধরনের মুদ্রা তৈরি করতে শিখেছিল উপমহাদেশের মানুষ। ইন্দো-গ্রিকরা উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা চালু করেন। বিজ্ঞান বিশেষত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গ্রিক ও ভারতীয় ভাবনাচিন্তার বিনিময় দেখা যায়। তাছাড়া ঐ সময় গ্রিক প্রভাবিত শিল্পের চর্চাও শুরু হয়েছিল। যার অন্যতম উদাহরণ হলো গন্ধার শিল্প।

টুকরো কথা
গন্ধার শিল্প

গন্ধার প্রদেশে নানা কারণে বিভিন্ন জাতির মেলামেশার সুযোগ ছিল। সেই মেলামেশার ছাপ ঐ অঞ্চলের শিল্পেও পড়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে ঘিরে গন্ধার শিল্প গড়ে উঠেছিল। আগে বুদ্ধের মূর্তি বানানো ও পুজো করা নিষিদ্ধ ছিল। গন্ধারের শিল্পীরা নতুন ধরনের বুদ্ধ মূর্তি তৈরি করেন। নাক টিকালো, টানা ভুরু ও আধবোজা চোখ মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য। মূর্তির পায়ের জুতোগুলিও রোমান জুতোর মতো দেখতে হতো। সোনালি রংয়ের ব্যবহারও মূর্তিগুলিতে দেখা যায়। সবমিলিয়ে গন্ধার শিল্পে গ্রিক ও রোমান শিল্পের ছাপ দেখা যায়। যদিও গন্ধার মূর্তিগুলির পিছনে ভাবনাচিন্তা ছিল ভারতীয় রীতির। পাশাপাশি ইরানীয় ও মধ্য এশীয় শিল্পের ছাপও গন্ধার শিল্পে পড়েছিল। গন্ধার অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে নানান শিল্পের প্রভাব সেখানে মিলেমিশে গিয়েছিল।

ছবি. ৯.৭: গৌতম বুদ্ধ, গন্ধার শৈলী

শক শাসকরা নানারকম রুপোর মুদ্রা চালু করেন। কয়েকটি মুদ্রায় গ্রিক ও প্রাকৃত দুই লিপিতেই লেখা হতো। শক শাসক মোগ নিজের মুদ্রায় *রাজাতিরাজ* উপাধিও ব্যবহার করেন। এই উপাধিটি খেয়াল রাখা দরকার। *রাজাধিরাজ* থেকেই উপাধিটি এসেছে। শক শাসক রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তি সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম বড়ো লেখ। তার আগে সব লেখই প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

শক-পহ্লব ও কুষাণদের জীবনযাপনের নানা উপাদান উপমহাদেশের জীবনযাপনে ছাপ ফেলেছিল। আবার তারাও উপমহাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম থেকে অনেক কিছু নিয়েছিল। যুদ্ধরীতি, পোশাক, ঘর-বাড়ি ও সংস্কৃতির নানা কিছুতেই সেই বিনিময়ের নজির আছে।

শক-পহ্লবরা যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহারকে উন্নত করেছিল। পহ্লবরা চলন্ত ঘোড়ায় বসে পিছনে ঘুরে তির ছোঁড়ার কায়দা চালু করে। উপমহাদেশে ঘোড়ার

লাগাম ও জিনের ব্যবহার শুরু করেছিল শক-পহ্লবরা। কুষাণরাও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে খুব পটু ছিল।

শক-কুষাণরা উপমহাদেশে নানারকম পোশাক চালু করেছিল। যেমন, জামা, পাজামা, লম্বা জোব্বা, বেল্ট, জুতো প্রভৃতি। শক ও কুষাণ আমলে নগরের পাঁচিলগুলি তৈরি হতো ইট দিয়ে। তাছাড়া একধরনের লাল মাটির পাত্র কুষাণ আমলে বানানো হতো। ঐ মাটির পাত্র বানাবার পদ্ধতি মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশে এসেছিল।

মধ্য এশিয়া থেকে আসা এইসব শাসকরা অনেকেই বিষ্ণুর উপাসক হয়ে পড়েন। আবার অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কুষাণরা শিব, বিষ্ণু ও বুদ্ধের উপাসনা করেছিলেন। কুষাণদের মুদ্রায় গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত ছিল। আগে গৌতমবুদ্ধের কোনো মূর্তি পুজো হতো না। বুদ্ধের কোনো প্রতীক বা চিহ্নকে সামনে রেখে পুজো করা হতো।

উপমহাদেশের নাটকের চর্চার উপরেও গ্রিক প্রভাব পড়েছিল। নাটকের মঞ্চ বানানো, পর্দার ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেই প্রভাব দেখা গিয়েছিল। নাটকের পর্দাকে সংস্কৃতে *যবনিকা* বলা হয়। গ্রিকরাই এই পর্দা ফেলার প্রথা চালু করেছিল। তাদের *যবন* নাম থেকেই *যবনিকা* শব্দটি তৈরি হয়েছিল। সাহিত্যচর্চার প্রতিও এই শাসকদের অনেকে উৎসাহী ছিলেন।

ধীরে ধীরে এইসব বিদেশি জাতি-উপজাতিগুলি উপমহাদেশের সমাজে মিশে গিয়েছিল। তাদের ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধৃশ্রেণি বলে মনে করা হতো। তবে ব্রাহ্মণদের চোখে তারা ছিল নীচু শ্রেণির ক্ষত্রিয়।

বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের আরেকটি মাধ্যম ছিল। অনেক পণ্ডিত শিক্ষক উপমহাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে যেতেন, শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা করতে বাইরে থেকে শিক্ষার্থীরাও আসতেন। ঐসব দেশের মধ্যে চিন দেশে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা সবথেকে জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে চিন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার বেড়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের কাশ্মীর অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা হতো। বুদ্ধযশ ছিলেন তেমনই একজন কাশ্মীরি বৌদ্ধ পণ্ডিত। পড়াশোনা শেষে তিনি মধ্য এশিয়ার কাশগড়ে চলে যান। কুমারজীবের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। পণ্ডিত পরমার্থও চিনে গিয়েছিলেন পড়াশোনার কারণে। অনেক বৌদ্ধ সাহিত্য সঙ্গে নিয়ে ৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিনে পৌঁছোন। বাকি জীবন সেখানেই থেকে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষাচর্চা করেন।

টুকরো কথা

জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চায় বিনিময়

ভারতীয়, গ্রিক, ব্যাবিলন ও রোমান জ্যোতি-র্বিজ্ঞান চর্চা একে অন্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার একটি বিখ্যাত বই ছিল **যবনজাতক**। বইটি আদতে গ্রিক ভাষায় লেখা। আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সেটি সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। তাই তার নামে যবন কথাটা পাওয়া যায়। এর থেকে গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানের দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টা বোঝা যায়। বরাহমিহিরের **পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা** বইটিতেও সেই প্রভাবের নজির রয়েছে। সেখানে বরাহমিহির জ্যোতি-র্বিজ্ঞান বিষয়ে **পৌলিশ** ও **রোমক** সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করেছেন। পৌলিশ সিদ্ধান্তটি গ্রিস ও রোমক সিদ্ধান্তটি রোম থেকে এসেছিল।

টুকরো কথা
কুমারজীব

ছবি. ৯.৮:
কুমারজীবের মূর্তি, কিজিল গুহা, কুচি প্রদেশ, চিন

কুমারজীবের বাবা কুমারাযান কুচিতে চলে গিয়েছিলেন। কুচির রাজা তাঁকে রাজগুরুর পদ দিয়েছিলেন। কুমারজীবের জন্মের পরে তাঁর মা জীব বৌদ্ধ হয়ে যান। ফলে ন-বছরের কুমারজীব (৩৪৩ খ্রিস্টাব্দ- ৪১৩ খ্রিস্টাব্দ) মায়ের সঙ্গে চলে যান কাশ্মীরে। সেখানে বন্ধুদত্তের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করেন। পড়াশোনা শেষে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরেন কুমারজীব। ততদিনে পণ্ডিত হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। কিছু দিন পরে চিনের শাসক কুচি আক্রমণ করেন। কুমারজীব তখন কুচিতে ছিলেন। ৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে কুমারজীবকে কুচি থেকে কান-সু প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। চিন সম্রাটের অনুরোধে ৪০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিনের রাজধানীতে যান। পরবর্তী এগারো বছর কুমারজীব চিনের রাজধানীতেই ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পড়াশোনাতেই তাঁর জীবন কেটেছিল। সংস্কৃত ও চিনা দু-ভাষাতেই কুমারজীব দক্ষ ছিলেন। ফলে অনুবাদের কাজ খুব সহজেই তিনি করতে পারতেন। চিনে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে কুমারজীবের ভূমিকা বিখ্যাত।

ভারত থেকে চিনে শিক্ষকদের যাতায়াতের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে চিনের উৎসাহ তৈরি হয়। সেই উৎসাহের ফলেই চিন থেকে বেশ কিছু মানুষ ভারতে আসতে থাকেন। তাঁরা ভারতে পড়াশোনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রগুলি ঘুরেও দেখেছিলেন। তাও-নান নামের এক চিনা পণ্ডিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভারতে আসার উৎসাহ দিয়েছিলেন। তার রেশ ধরেই ভারতে এসেছিলেন ফাসিয়ান। ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে পাঁচজন সহসন্ন্যাসী সমেত ফাসিয়ান ভারতে পৌঁছোন। তিনি কাশ্মীর হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। পরে উত্তর ভারতের বহু অঞ্চল ঘুরে দেখেছিলেন তিনি। তিন বছর পাটলিপুত্রে থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা করেছিলেন ফাসিয়ান। দু-বছর তিনি তাম্রলিপ্ততেও ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা *ফো-কুয়ো-কি* বইতে তিনি লিখেছিলেন। দেশে ফেরার সময় ভারত ও সিংহল থেকে অনেক বৌদ্ধপুঁথি নিয়ে গিয়েছিলেন ফাসিয়ান।

ফাসিয়ানের পরে আরও অনেক পণ্ডিতই চিন থেকে উপমহাদেশে পড়াশোনার জন্য এসেছিলেন। তাঁরা অনেকেই নালন্দা মহাবিহারে থেকে পড়াশোনা করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিষয়েও চর্চা হতো। তাছাড়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ও শিক্ষা নিতেন তাঁরা।
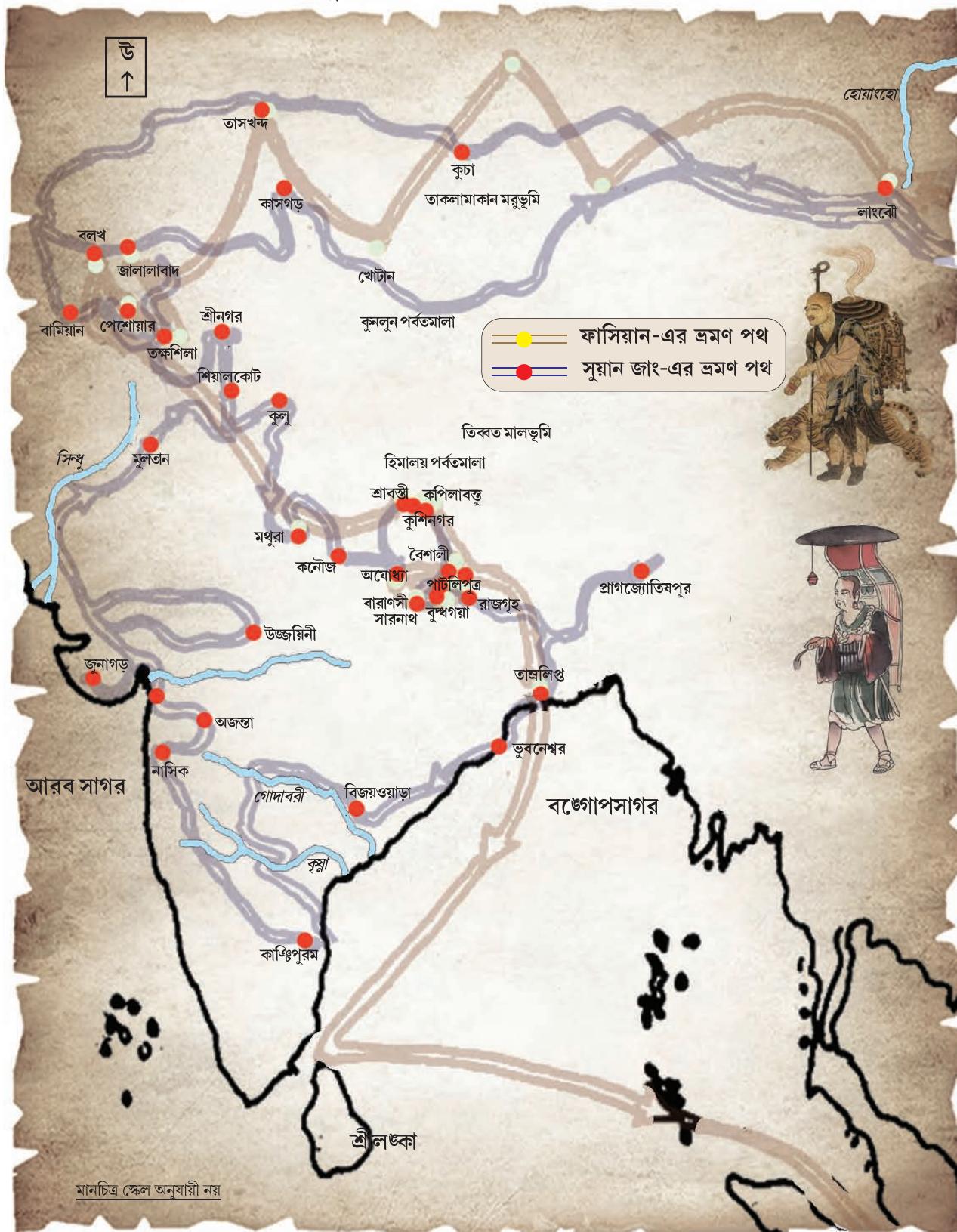
খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে প্রথম দিকে চিন থেকে উপমহাদেশে এসেছিলেন সুয়ান জাং। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি উপমহাদেশে পৌঁছোন। হর্ষবর্ধন তখন কনৌজ শাসন করছিলেন। পরবর্তী চোদ্দো বছর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান সুয়ান জাং। নালন্দা মহাবিহারে পণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে পড়াশোনা করেন তিনি।

মানচিত্র ৯.২ :
ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং-এর ভারতীয় উপমহাদেশে ভ্রমণ পথ

উ

ফাসিয়ান-এর ভ্রমণ পথ
সুয়ান জাং-এর ভ্রমণ পথ

তাসখন্দ
কুচা
হোয়াংহো
কাসগড়
তাকলামাকান মরুভূমি
লাংঝৌ
বলখ
জালালাবাদ
খোটান
বামিয়ান
পেশোয়ার
শ্রীনগর
কুনলুন পর্বতমালা
তক্ষশিলা
শিয়ালকোট
কুলু
সিন্ধু
মুলতান
তিব্বত মালভূমি
হিমালয় পর্বতমালা
শ্রাবস্তী
কপিলাবস্তু
কুশিনগর
মথুরা
বৈশালী
কনৌজ
অযোধ্যা
পাটলিপুত্র
প্রাগজ্যোতিষপুর
বারাণসী
সারনাথ
বুদ্ধগয়া
রাজগৃহ
উজ্জয়িনী
জুনাগড়
তাম্রলিপ্ত
অজন্তা
ভুবনেশ্বর
নাসিক
আরব সাগর
গোদাবরী
বিজয়ওয়াড়া
বঙ্গোপসাগর
কৃষ্ণা
কাঞ্চিপুরম
শ্রীলঙ্কা

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

ভেবে দেখো

১। **বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :**

১.১) ভৃগুকচ্ছ, কল্যাণ, সোপারা, তাম্রলিপ্ত।

১.২) বুদ্ধযশ, কুমারজীব, পরমার্থ, সুয়ান জাং।

১.৩) আলেকজান্ডার, সেলিউকাস, কনিষ্ক, মিনান্দার।

২। **ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
নকস-ই রুস্তম	সিরিয়া
ভৃগুকচ্ছ	প্রথম দরায়বৌষ
প্রথম অ্যান্টিওকস	নর্মদা নদী

৩। **সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১) হেরোডোটাসের মতে ইন্দুস ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের একটি — (প্রদেশ /দেশ/ জেলা)।

৩.২) ইন্দো-গ্রিক বলা হতো — (শকদের/ব্যাকট্রিয়ার অধিবাসীদের/ কুষাণদের)।

৩.৩) সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন — (আলেকজান্ডার/ মিনান্দার/ গন্ডোফারনেস)-এর আমলে।

৪। **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :**

৪.১) আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযানের কি মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার উপরে কোনো প্রভাব ছিল?

৪.২) শক-কুষাণরা আসার আগে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কী কী বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

৪.৩) প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পড়াশোনার কী ভূমিকা ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৫। **হাতেকলমে করো :**

৫.১) নবম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির সঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির মিল ও অমিলগুলি খুঁজে বার করো।

৫.২) ৯.২ মানচিত্রটি ভালো করে দেখো। ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলেন? কোন কোন জায়গায় দুজনেই গিয়েছিলেন? তার একটি তালিকা তৈরি করো।

তোমার পাতা

ইতিহাস পড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা কেমন হলো? কতটা আনন্দ, কতটা মজা পেলে সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা জেনে? আর কী কী থাকলে আরো মজায় ও আনন্দে ইতিহাস জানা যেত? তোমার সেসব ভাবনা এই পাতাটায় লিখে রাখো বছর শেষে ....

শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির ষষ্ঠ শ্রেণিতে পৃথক বিষয় হিসাবে ইতিহাসচর্চা শুরু হবে। সেই মতো পঠন-পাঠনের জন্য *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো।

- ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫)-র নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি, তালিকা এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।

- এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অথবা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যভাবেও অধ্যায়গুলি সাজিয়ে নিতে পারে। বইতে মূল উচ্চারণের দিকে নজর রেখে নানা স্থান ও ব্যক্তিনাম এবং সিন্ধু নদের পাঁচটি নদীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত অন্য নামগুলিও বলা যেতে পারে যেমন:

  ক) ইন্দাস / সিন্ধু, ঝিলাম/ বিতস্তা, চেনাব/ চন্দ্রভাগা, সাটলেজ/ শতদ্রু, রাভি/ ইরাবতী, বিয়াস/ বিপাশা। খ) মূল চিনা ভাষার উচ্চারণ বজায় রেখে নিম্নোক্ত নামগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন-ফা হিয়েন /ফাসিয়ান, হিউয়েন সাঙ/সুয়ান জাং। গ) ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য প্রাক্, ঋক্ প্রভৃতি শব্দে হসন্ত (্) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি।

- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি ৮৫টি 'টুকরো কথা' শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা বৈচিত্র্যময় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ২১, ৩৯, ৫২, ৫৬, ৭৪, ৯২, ১০৮, ১১২, ১২১ এবং ১৪৪ পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।

- এই বইটির ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ছবি নয়। ছবিকে সব সময়েই বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি মূল পাঠ্যবিষয়বস্তুরই অঙ্গ।

- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে।

- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাল-তারিখ। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের (প্রথম অধ্যায়ে) প্রাথমিক কিন্তু বিস্তারিত ও সহজবোধ্য ধারণা দেওয়া হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। রাজা-রাজড়াদের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে এমন কোনো দাবিও আমাদের নেই। সাধারণভাবে শাসকবংশগুলির বিশদ এবং ধারাবাহিক ইতিহাসের

বিবরণ এখানে বাদ রাখা হয়েছে। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- অনেক পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। পাঠ্যবিষয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে দেবেন।
- দ্বিতীয় অধ্যায়ে *আদিম মানুষের নানারকম* শীর্ষক টুকরো কথায় মানুষের বিবর্তনের চারটি মূল পর্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও ঐ পর্বগুলির মধ্যে মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব রয়েছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকারা সেই পর্বগুলিও সহজ সাবলীলভাবে তুলে ধরতে পারেন।
- প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে/শ্রেণিকক্ষে ইতিহাসের মানচিত্র, চার্ট ও তালিকা, মডেল, ছবি সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরও বিভিন্ন সূত্র থেকে ছবি সংগ্রহ/বিবরণ প্রদর্শনে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের মনে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ তৈরির জন্য স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নস্থল এবং প্রয়োজন বোধে সংগ্রহালয় (মিউজিয়ম) প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা করা যেতে পারে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যালি ও অভিনব তথা সৃজনশীল প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে **ভেবে বলো** শীর্ষক এবং অধ্যায়ের শেষে **ভেবে দেখো খুঁজে দেখো**-র অন্তর্গত **হাতেকলমে** শীর্ষক কৃত্যালিগুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নমুনা অনুশীলনী **'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো'** দেওয়া আছে, তার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসম্ভার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে। প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন অনুশীলনীতে রাখা হয়নি। মূল্যায়নের সময় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানের সূত্র ধরে অতীতের কোনো বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে।
- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(**এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে**)। (**বি.দ্র.:** ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না। ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।